প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণির জন্য যে পাঠ্যক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমত কোনো কোনো বিষয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণ ক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান না করে নিয়ে নিয়ত মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে—যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূরসঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এইসব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন ; যখনই কোন শিক্ষার্থী এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষামণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনও শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। এর পর যেখানে যতটুকু অস্পষ্টতা দেখা দেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠকেন্দ্রে নিযুক্ত শিক্ষা-সহায়কগণের পরামর্শে তার নিরসন অবশ্যই হ'তে পারবে। তার ওপর প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণ ক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশকিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক—অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

জয়দীপ শীল
কার্যনির্বাহী উপাচার্য

প্রথম পুনর্মুদ্রণ ঃ সেপ্টেম্বর, 2008

ভারত সরকারের দূরশিক্ষা পর্ষদের বিধি অনুযায়ী এবং অর্থানুকূল্যে মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations and financial assistance
of the Distance Education Council, Government of India.

পরিচিতি

বিষয় ঃ ইতিহাস **স্নাতকোত্তর স্তর**

পাঠক্রম

অষ্টম (খ) পত্র

পর্যায় — 4

	রচনা	**সম্পাদনা**
একক 1 ঃ	শ্রী সুরজিৎ গুপ্ত	ড. চন্দন বসু
একক 2 ঃ	শ্রীমতী নিবেদিতা পাল	ড. চন্দন বসু

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

ঘোষণা

এই পাঠ-সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোন অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

জয়দীপ শীল

নিবন্ধক

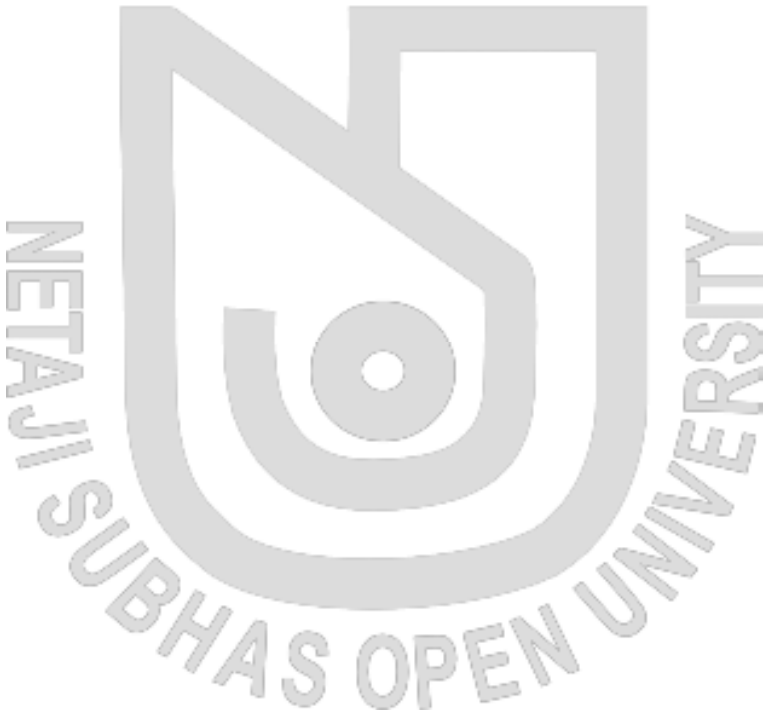
NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

ইতিহাস — অষ্টম (খ)

(স্নাতকোত্তর পাঠক্রম)

পর্যায়
4

একক **1**	বিজয়নগর সাম্রাজ্যের অর্থনীতি	1
একক **2**	বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা ও বাহমনি রাজ্যের অর্থনীতি	16

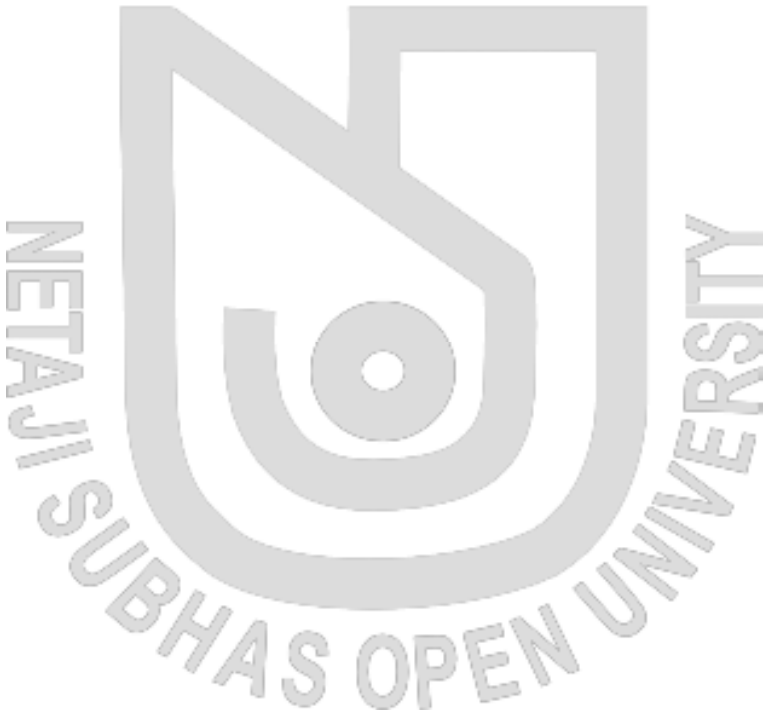
NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

একক ১ বিজয়নগর সাম্রাজ্যের অর্থনীতি

গঠন

১.১ উদ্দেশ্য

১.২ সূচনা

১.৩ বিজয়নগরের অর্থব্যবস্থার প্রকৃতি

১.৪ বিজয়নগরের কৃষিব্যবস্থা

১.৫ বিজয়নগরের করব্যবস্থা

১.৬ নায়ঙ্কারা (নায়ক) প্রথা

১.৭ বিদেশী পর্যটকদের দৃষ্টিতে বিজয়নগরের অর্থনীতি

১.৮ সংক্ষিপ্তসার

১.৯ অনুশীলনী

১.১০ গ্রন্থপঞ্জী

১.১ উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্য হ'ল বিজয়নগরের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার গঠন প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা। বিজয়নগরের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পশ্চাতে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, নায়ক প্রথার বৈশিষ্ট্যসমূহ, কৃষিব্যবস্থার সংগঠন ইত্যাদি বিষয়গুলি অলোচিত হবে। বিজয়নগর রাজ্যে আগত বিদেশী পর্যটকগণ সেখানকার অর্থনীতি ও সমৃদ্ধি সম্পর্কে যেসকল মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন সেগুলিও আলোচিত হবে। এর মাধ্যমে একথা বোঝা যাবে, যে বিজয়নগরের আর্থিক সমৃদ্ধির প্রেক্ষাপট কি ছিল এবং এই সমৃদ্ধির স্বরূপ কি ছিল।

১.২ সূচনা

দিল্লী সুলতানীর ভাঙনের কালে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে যে সকল স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব ঘটেছিল তাদের মধ্যে দক্ষিণ ভারতের বিজয়নগর সাম্রাজ্য অন্যতম। প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক, ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিজয়নগরের অবদান ভারতের ইতিহাসে এক গৌরবময় স্থান অধিকার করে আছে। বিজয়নগরের অর্থব্যবস্থার ভিত্তি ও প্রকৃতি নিয়ে ঐতিহাসিকগণ নানা মত প্রকাশ করেছেন। সামন্ততান্ত্রিকতার আভাস থাকলেও বিজয়নগরকে সামন্তরাষ্ট্র বলা যায় কিনা তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্ক আছে।

১.৩ বিজয়নগরের অর্থব্যবস্থার প্রকৃতি

দিল্লী সুলতানী যখন মধ্যগগনে সেই সময়ে দক্ষিণভারতে বিজয়নগর রাজ্যের উত্থান হয় যা দীর্ঘ দু'শো বছর ধরে, নানা বিঘ্ন বিপর্যয় অতিক্রম করে টিকে ছিল। ১৩৩৬ খ্রীঃ সঙ্গম বংশের প্রথম হরিহর তুঙ্গাভদ্রা নদীর দক্ষিণ তীরে তাঁর স্বাধীন রাজ্য বিজয়নগর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। একাদিক্রমে সঙ্গম, সুলুভ, তুলুভ এবং আড়বিরু বংশের অধীনে ১৫৬৫ খ্রীঃ পর্যন্ত বিজয়নগর মোটামুটি নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। হিন্দু রাজ্য বিজয়নগরের সীমানা ঘেঁষে জন্ম নিয়েছিল আরেকটি স্বাধীন রাজ্য বাহমনী। এই রাজ্যটি ছিল মুসলমান। ফলতঃ দুই ভিন্ন ধর্মী প্রতিবেশী রাজ্যের মধ্যে নিরন্তর সংঘর্ষ চলেছিল। এই তীব্র বিরোধের মধ্যেও বিজয়নগর চমকপ্রদভাবে গড়ে উঠেছিল। বহুবার শত্রুর দ্বারা লুণ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও তার সম্পদের ঘাটতি ছিল না এবং যত বিদেশী পর্যটক বিজয়নগরে এসেছিলেন, তাঁরা প্রত্যেকেই সেই সম্পদের কথা লিখেছেন।

বিজয়নগর সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ঐতিহাসিক কে, এ, নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী এই রাজ্যকে ভারতের ইতিহাসে একমাত্র সামরিক রাষ্ট্র হিসাবে বর্ণনা করেছেন। এই অবস্থা অকস্মাৎ সৃষ্টি হয়নি। ত্রয়োদশ শতকে চোল রাজ্যের পতন এবং কাবেরী নদী উপত্যকায় হয়সলদের উত্থান ঐ অঞ্চলে এক নতুন যুগের সূচনা করে। এর ফলে তামিল অঞ্চলের অধিকারের প্রশ্নে কন্নড়ভাষী হয়সলদের সঙ্গে তামিল ভাষী পাণ্ড্যদের এক দীর্ঘকালীন যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। একদিকে উন্নতমানের কৃষি ও অন্যদিকে বাণিজ্য-দুটোই লোভনীয় ছিল এবং এসবের ফলেই সংঘর্ষ দীর্ঘকালীন রূপ লাভ করে।

চোল রাজারা নানা আভ্যন্তরীণ সংকটে নিমজ্জিত ছিলেন। কাবেরী উপত্যকার বাইরে 'পেরিয়ানাট্টার'গুলি (স্বত্ত্বাধিকারী কৃষকদের সংগঠন 'নাট্যার'গুলির যৌথরূপ) ক্রমবর্ধমান হারে শক্তিশালী হতে থাকায় কেন্দ্রীয় শক্তির প্রভাব দীর্ঘকাল ধরে নানাভাবে ক্ষুণ্ণ হচ্ছিল। এমনকি ত্রয়োদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে চোলদের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত দ্বন্দ্বে তারা একাধিকবার নাক গলাতেও ছাড়েনি। ফলতঃ কাবেরী উপত্যকায় কোনো কেন্দ্রীয় শাসন চোলরাজারা বজায় রাখতে পারেননি। বলা চলে যে এই পরিস্থিতির ফলেই বিজয়নগরের উত্থান সম্ভব হয়েছিল। চতুর্দশ শতকে তামিল রাজ্যগুলি আর আগের মত শক্তিশালী ও বৃহৎ থাকতে পারেনি। একাধিক ছোট রাজ্য চোল ও পাণ্ড্য রাজত্বের উত্তরাধিকারস্বরূপ জন্মলাভ করে।

এইরকম পরিবেশে বিজয়নগর এক শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার গোড়াপত্তন করে। তাদের প্রশাসন একই সঙ্গে সমরবিভাগ ও রাজস্ববিভাগকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়ার ফলেই কেন্দ্রিকতার প্রবণতা দৃঢ়মূল হতে পেরেছিল। ডঃ ইরফান হাবিব মনে করেন যে, এই দুই ক্ষেত্রেই বিজয়নগর দিল্লী সুলতানীর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। ইতিমধ্যে তেলেগুভাষী অঞ্চলে সুলতানী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই অঞ্চল বিজয়নগরের রাষ্ট্র ব্যবস্থার কেন্দ্রস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। ফলে সেখান থেকেই বিজনয়গর দিল্লী সুলতানীর বহু প্রশাসনিক বিধিনিয়ম অনুকরণ করতে সমর্থ হয়েছিল।

একই সময়ে কৃষ্ণা নদীর উত্তরে মুসলমান রাজ্যের উপস্থিতিও বিজয়নগরের কাজ অনেক সহজ করে দেয়। বাহমনী রাজ্যের উত্থানের ফলে দক্ষিণের হিন্দু রাজ্যগুলি আতঙ্কিত হয়ে ওঠে এবং স্বাভাবিক কারণে তারা বিজয়নগরের দিকে তাকায়। তাই বিজয়নগরের বিস্তারের ফলে প্রাথমিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এইসব হিন্দুরাজ্য যেমন, কর্ণাটকের হয়সল রাজ্য, অন্ধ্রের রেড্ডিরাজ্য। বিজয়নগরের বৃদ্ধির কালে এই অঞ্চল থেকেই যুদ্ধের সেনাদের সংগ্রহ করা হত এবং বিজয়নগরের পক্ষে সুদূর দক্ষিণে তামিল এলাকায় এই সেনারা শোষণ চালাত। ডঃ বার্টন স্টেইন বিজনগরের অর্থব্যবস্থায় এই অঞ্চলের বিশেষ অবদানের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে প্রাথমিকভাবে ভাষাগত ও জাতিগত কারণের ফলে এই শোষণ সম্ভব হয়েছিল। কন্নড় ও তেলেগু ভাষীরা বিজয়নগরের প্রতিনিধিস্বরূপ গিয়েছিল তামিলভাষী এলাকায়, দ্বিতীয়তঃ, ছোট ছোট তামিল রাজ্যকে শোষণ করাও সুবিধাজনক হয়েছিল।

১.৪ বিজয়নগরের কৃষিব্যবস্থা

পণ্ডিত নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী লিখেছেন যে বিজয়নগরের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ গ্রামে বসবাস করতো এবং তাদের প্রধান জীবিকা ছিল কৃষি উৎপাদন। জমির মালিকরা সকল বৃত্তির মানুষের কাছেই সামাজিক মর্যাদার দ্যোতক হিসাবে বিবেচিত হত। এইভাবে গ্রামগুলি কৃষক ও ভূস্বামিদের আবাসস্থলে পরিণত হয়েছিল। অতীতকাল থেকেই এখানে কৃষিযোগ্য জমি গ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে সময়ভিত্তিক বণ্টন করা হত। ছোট বড় ভূস্বামী ছাড়াও ছিল অসংখ্য ভূমিহীন ক্ষেতমজুর। এই 'কৃষক-সর্বহারা' (agrarian-proletariat) শ্রেণি ছিল কৃষি উৎপাদনের প্রধান শক্তি। তবে এদের অধিকাংশের অবস্থা ছিল ভূমিদাসদের সমতূল্য। সামাজিক ক্ষেত্রে গুরুত্বহীন এই শ্রেণির মানুষ নিজেদের অবস্থার রূপান্তর ঘটানোর কোনও ক্ষমতাই ধরতো না। কামার, কুমোর, তাঁতি ইত্যাদি ক্ষুদ্র কারিগরদের গ্রামে আটকে রাখার জন্য কিছু কিছু জমি চাষের অধিকার দেওয়া হত। নিম্নবর্গের গৃহভৃত্যদের কাজের বিনিময়েও কিছু জমি বরাদ্দ করা হত।

দৈনিক কৃষি মজুরদের সাধারণত উৎপন্ন শস্যে মজুরী দেওয়া হত। বর্গা চাষ বিজয়নগরে জনপ্রিয় ছিল। বিশেষতঃ, মঠ ও মন্দিরের জমিগুলি বর্গা বা ভাগচাষীদের মধ্যে বণ্টন করে চাষাবাদ করা হত। ডঃ নীলকণ্ঠ শাস্ত্রীর মতে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই ধরণের বর্গাচাষে কৃষক বা বর্গাদার জমির আংশিক মালিকানার অধিকারী হয়ে যেতেন।

খাদ্যশস্য ও ডাল জাতীয় শস্য উৎপাদনের পাশাপাশি বিজয়নগরে ফুল, ফল ও অন্যান্য কাঁচা আনাজের চাষ জনপ্রিয় ছিল। কালক্রমে বিভিন্ন অর্থকরী বাণিজ্যিক পণ্য যেমন তুলা, আখ ইত্যাদি চাষের দিকেও বিজয়নগরের কৃষকরা নজর দেয়। বড় বড় বাগিচাগুলিতে পান, সুপারি, আদা, হলুদ ও নানারকম ফল, ফুল চাষ হত। পর্যটক আবদুর রজ্জাক বিজয়নগরের গোলাপ ব্যবসায়ীদের সংখ্যাধিক্যের কারণ প্রসঙ্গে বলেছেন যে বিজয়নগরে খাদ্যের মতই জনজীবনে গোলাপের ব্যবহার গুরুত্ব পেত।

বিজয়নগরে জলসেচের ব্যবস্থার উপরে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হত। এজন্য নদী ও খালের উপর বাঁধ দিয়ে কৃষি জমিতে জলের যোগান দেওয়া হত। যেসব এলাকায় প্রাকৃতিকভাবে জল যোগানের সুযোগ ছিল না, সেখানে জলাশয় খনন করে জমিতে জলসেচ দেওয়া হত। সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ

এই সকল জলাশয় রক্ষণাবেক্ষণে বিশেষ নজর রাখতেন। অনাবাদী জমিকে কৃষিজমিতে উন্নীত করার জন্য কৃষকদের উৎসাহ দেওয়া হত। এই সকল ক্ষেত্রে উদ্যোগী কৃষকদের করভার লাঘব করে কিংবা বিশেষ সুযোগসুবিধা প্রদান করে উৎসাহিত করা হত।

সাধারণভাবে কৃষকদের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর নির্ভর করত। তবে এজন্য কৃষকদের অধীন জমির বন্দোবস্তের শর্তাদি ও রাজস্ব আদায়কারী সংগঠনের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ধর্মপ্রতিষ্ঠান বা জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের জমিতে চাষরত কৃষকদের অবস্থা তুলনামূলকভাবে ভালো ছিল। ভূস্বামী হিসাবে মঠ বা মন্দির কর্তৃপক্ষ অনেক বেশী সহনশীল ও উদার ছিলেন। উচ্চপদস্থ কর্মচারী বা অভিজাতদের মালিকানাধীন জমির কৃষকদের উপর করের বোঝা ছিল সাধারণভাবে নিপীড়নমূলক। নায়ঙ্কর ব্যবস্থা জোরালো হলে কৃষকরা নায়কদের নির্ধারিত মূল্যে নগদ অর্থে শস্য কিনতে বাধ্য হত। এতে কৃষকদের অবস্থার দারুণ অবনতি ঘটে।

কৃষিকাজের পাশাপাশি গো-পালন ও দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদন বিজয়নগর রাজ্যে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কৃষি জমির বাইরে গো-চারণ ক্ষেত্র নির্দিষ্ট করা থাকত। মন্দির কর্তৃপক্ষের অধীনে বহু গবাদি পশু থাকত। বিভিন্ন মন্দিরে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের জন্য জ্বালানী হিসাবে ঘি ব্যবহার করা হত। এছাড়া অভিজাত শ্রেণির খাদ্য তালিকায় গব্যঘৃত ছিল অতি আবশ্যিক একটি পদ। স্বভাবতই গো-পালন বিজয়নগর রাজ্যে একটি প্রয়োজনীয় ও লাভজনক বৃত্তি হিসাবে গণ্য হত।

১.৫ বিজয়নগরের কর ব্যবস্থা

বিজয়নগরের কর ব্যবস্থার কেন্দ্রে ছিল ভূমি-রাজস্ব। এছাড়াও প্রজাদের কাছ থেকে সম্পদ কর, বিক্রয় কর, যুদ্ধ কর, বিবাহ কর, বেগার শ্রম ইত্যাদি আদায় করা হত।

ভূমি-রাজস্ব নির্ধারণের জন্য সরকার একাধিক বিষয় বিবেচনা করত। উক্ত জমি দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা কিনা, এছাড়া জমির পরিমাণ, উৎপাদিকা শক্তি, জমির চরিত্র অর্থাৎ সেচ বা অ-সেচ এলাকার অন্তর্ভুক্ত কিনা ইত্যাদি বিবেচনা করা হত। জমির উর্বরতার ভিত্তিতে একই অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের নির্ধারিত হত। মোটামুটিভাবে পরিষ্কার যে, মোট উৎপাদনের উপর রাজস্ব নির্ধারণ করা হত। ইংরাজ পর্যটক হ্যামিলটনের বিবরণ (১৯ শতক) থেকে জানা যায় যে, রাজা কৃষ্ণদেব রায় জমি জরিপ

করে রাজস্ব নির্ধারণের বিষয়ে যত্নবান ছিলেন। সম্ভবত, জলাজমি ও শুকনো জমি তিনি পৃথক পৃথক ভাবে জরিপের ব্যবস্থা করেন। সমকালীন শিলালেখ থেকে জমি জরিপের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন মাপ ব্যবহারের কথা জানা যায়। আবার একই এলাকায় দুধরণের মাপ ব্যবহার করা হচ্ছে এমন দৃষ্টান্তও আছে। সরকার অবশ্য একই ধরণের মাপ ব্যবহারের পক্ষপাতি ছিল। 'বৃদ্ধচলম'-এর একটি শিলালেখ থেকে জানা যায় যে একইরকম মাপ চালু না থাকার ফলে কৃষকেরা ঘন ঘন বাসস্থান পরিবর্তন করত। এতে কৃষি উৎপাদন ব্যহত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। সাধারণভাবে সরকার উৎপাদনের ১/৬ অংশ কর হিসাবে নিত। ব্রহ্মদেয় জমিতে কুড়িভাগের একভাগ এবং মন্দিরের জমিতে তিনভাগের একভাগ রাজস্ব আদায়ের রীতি ছিল। হরিহরের আমলে শস্যের পরিবর্তে নগদ টাকায় খাজনা নেওয়ার ব্যবস্থা চালু হয়। জমির উর্বরতা, বীজের ব্যবহার ও শস্যের গড় মূল্যের ভিত্তিতে শস্যকে টাকায় রূপান্তরিত করা হত। পণ্ডিত শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার সহ অনেকেই মনে করেন যে, বিজয়নগরের করের হার ছিল যথেষ্ট উঁচু। বিদেশী পর্যটকরা বিজয়নগরের শাসকদের অতুল সম্পদ ও বিলাস বৈভবের যে বিবরণ দিয়েছেন তার ভিত্তিতে অনুমান করা যায় যে প্রজাদের উপর যথেচ্ছ কর আদায় করা হত।

ভূমিরাজস্ব ছাড়াও বিজয়নগর রাজ্যে বৃত্তি কর, সামাজিক কর, ইত্যাদি আদায় করা হত। গ্রামের মোড়ল, মেষপালক, ছুতোর, ধোপা, নাপিত, কুমোর, স্বর্ণকার, ব্রাহ্মণ ইত্যাদি বিভিন্ন ব্যক্তির জন্য কর দিতে হত। সদাশিব রাও-এর আমলে নাপিতদের কর প্রদান থেকে রেহাই দেওয়া হয়। পেশাভিত্তিক কর বছরে একবার দিতে হত। কুটির শিল্পের কারিগরদের কর দিত হত। তাঁত, ঘানি, হীরকশিল্প, রেশমজরি, লৌহ-চুল্লি ইত্যাদি শিল্পে কর আরোপ করা হত। তবে এক্ষেত্রে করের পরিমাণ, কর নির্ধারণের ভিত্তি কি ছিল তা স্পষ্ট নয়। সামাজিক অনুষ্ঠানের জন্যও কর আদায় করা হত। রাজার পুত্র সন্তানের জন্ম উপলক্ষ্যে সামন্ত ও স্থানীয় নেতারা রাজাকে বিশেষ কর দিতেন। বিচারকার্য সম্পাদনের জন্য প্রাদেশিক কর্তা বা গ্রাম-প্রধান একধরনের কর আদায় করতেন। এই করের একাংশ রাজার প্রাপ্য ছিল। গ্রামের মন্দিরে অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য 'পিদারিভারী' নামক কর সংগ্রহ করা হত। নীচু জাতের লোকেদের ধর্মীয় কাজকর্ম করার জন্য গ্রাম-প্রধানরা অধস্তন কর্মী নিয়োগ করতেন। এদের বলা হত 'দাসারী'। অনুষ্ঠান শুরুর আগে নিচু জাতের লোকেরা 'দাসরী'দের একটা প্রাপ্য দিতে বাধ্য থাকত। এই অর্থের একটা অংশ রাজাকে দেওয়া হত। এই প্রথাকে বলা হত 'সমাচার'। সরকারি উচ্চ আমলা গ্রাম পরিদর্শনে এলে তাদের কিছু উপঢৌকন দিয়ে বরণ করা বাধ্যতামূলক ছিল।

মধ্যযুগের ভারতে বেগার শ্রম একটি বহুল প্রচলিত প্রথা ছিল। বিজয়নগরেও এই প্রথার প্রচলন ছিল। এই বিনা পরিশ্রমিকের বাধ্যতামূলক শ্রমকে বলা হত 'উলিয়াম'। রাস্তা নির্মাণ, সংস্কার ও সম্প্রসারণ, জলসেচের খাল খনন, মন্দিরের পাঁচিল নির্মাণ ইত্যাদি কাজ বেগার শ্রম হিসাবেই গণ্য হত। দূর্গ নির্মাণ বা সংস্কারের জন্যও স্থানীয় মানুষ বিনা মজুরীতে শ্রম দিতে বাধ্য হত। তবে এক্ষেত্রে বেগার শ্রম দিতে অপারগ হলে পরিবর্তে 'কৌট্টাজ' নামক কর দিয়ে রেহাই পাওয়া যেত।

বিজয়নগরের রাজস্ব দপ্তরের নাম ছিল 'অথবান'। রাজস্ব-বিষয়ক কেন্দ্রীয় কর্মী এটির তত্ত্বাবধান করতেন। রাজস্ব প্রধানকে সহযোগিতা করতেন প্রদেশ ও জেলাস্তরের আমলাবৃন্দ। কেন্দ্রীয় রাজস্ব দপ্তরকে ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত করে প্রতিটি বিভাগকে একজন করে দায়িত্বশীল আমলার তত্ত্বাবধানে রাখা হত। কর সংগ্রহের জন্য বিজয়নগরে চারটি প্রথার প্রচলন ছিল। একটি প্রথানুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার নিযুক্ত কর্মচারী সরাসরি উৎপাদকের কাছ থেকে কর সংগ্রহ করতেন। দ্বিতীয় প্রথায় সরকার কর আদায়ের দায়িত্ব ইজারা হিসাবে কোন ব্যক্তিকে অর্পণ করত। তৃতীয় প্রথা অনুযায়ী সরকার গ্রামের কিছু মানুষ বা গোষ্ঠীর সাথে ঐ এলাকার কর আদায়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ হত। চতুর্থ এবং শেষ প্রথাটি হল 'নায়ক' নামক এক বিশেষ ধরণের ভূস্বামীর হাতে সরকার সাম্রাজ্যের কিছু অংশ ইজারা দিয়ে নির্দিষ্ট সামরিক সাহায্য ও নির্দিষ্ট অংকের টাকা কর হিসাবে গ্রহণ করত। প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টির সময় বিজয়নগর রাজ্যে কৃষককে কর ছাড় দেওয়া হত। এই কর ছাড়ের ক্ষমতা ছিল একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থাৎ রাজার। 'ভালুডুর লেখ' (১৪০২-০৩ খ্রীঃ) এবং 'আদুতুরাই' লেখ (১৪৫০ খ্রীঃ) থেকে কর ছাড় দেবার উল্লেখ পাওয়া যায়।

১.৬ নায়ঙ্কারা (নায়ক) প্রথা

বিজয়নগর রাজ্যের সামরিক ব্যবস্থা ও ভূমিদান রীতির সাথে বিশেষভাবে জড়িত ছিল 'নায়ক' বা 'নায়ঙ্কারা' প্রথা। সংস্কৃত সাহিত্যে 'নায়ক' অর্থে নেতা বা বিশিষ্ট ব্যক্তিকে বোঝানো হয়। কিন্তু বিজয়নগরের 'নায়ক' প্রথা কিছুটা স্বতন্ত্র। নায়কদের অধিকার, কর্তব্য ও নায়কপ্রথার প্রকৃতি সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। অধ্যাপক অনিরুদ্ধ রায়ের মতে, বিজয়নগরের নায়করা স্থানীয় নেতৃবর্গের থেকে স্বাধীন। ফলে নতুন নতুন মানুষ সহজেই এই রাজনৈতিক কাঠামোর অন্তর্ভূক্ত হয়ে যেতে পারত। বিজয়নগরের বিভিন্ন শিলালেখতে 'অমরয়ঙ্কর' শব্দটি পাওয়া যায়। এখানে 'অমর' অর্থে

সৈন্যাধ্যক্ষ, 'নায়ক' অর্থে নেতা এবং 'কর' বলতে সরকারি কাজকে বোঝানো হয়েছে। এই ব্যাখ্যার ভিত্তিতে নায়ঙ্কার প্রথার বৈশিষ্ট্যগুলি অনুধাবন করা যায়।

পণ্ডিত নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী ১৯৪৬ সালে লিখেছিলেন যে, ১৫৬৫ সাল পর্যন্ত নায়করা বিজয়নগর রাজার উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল ছিলেন পরে তাঁরা আধা-স্বাধীন হয়ে যান। ১৯৫৫ সালে তিনি বলেন যে, নায়করা মূলত ছিলেন সামন্ত এবং তাঁরা রাজাকে সামরিক সাহায্য দানের শর্তে ভূমির অধিকার ভোগ করতেন। কিন্তু ১৯৬৪ সালে পণ্ডিত শাস্ত্রী তাঁর পূর্ব অভিমত থেকে সরে আসেন এবং বলেন যে, বিজয়নগর একটি 'যোদ্ধারাজ্য' বা War state এবং এই সাম্রাজ্যের গঠন তার সামরিক প্রয়োজনই গড়ে উঠেছে। তাঁর মতে বিজয়নগর সাম্রাজ্য ছিল অসংখ্য সামরিক নেতার মিলিত প্রয়াসের ফল। টি.ভি. মহালিঙ্গাম-এর বক্তব্যেও এই মতের সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন যে, বিজয়নগরের অভ্যন্তরীণ সংগঠনের প্রধান ভিত্তি ছিল 'নায়ঙ্কারা' ব্যবস্থা। এই প্রথানুযায়ী রাজা নায়কদের হাতে ভূমি-রাজস্বের অধিকার অর্পণ করতেন। নায়করা একাধারে ছিলেন সামরিক নেতা ও স্থানীয় প্রশাসক। এছাড়া তাঁরা নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের আদায়ীকৃত রাজস্বের একাংশও কেন্দ্রীয় কোষাগারে জমা দিতেন। তামিল দেশে পনেরো শতকের শেষভাগে ও ষোড়শ শতকের গোড়ায় নায়ঙ্কারা প্রথার ব্যাপকতা দেখা যায়। তামিল এলাকার অধিকাংশ নায়ক ছিলেন বাহিরাগত তেলেগু যোদ্ধা। এই যোদ্ধারা এবং তাদের কৃষকরা তামিল সমভূমি অঞ্চলের সমৃদ্ধ অবস্থা দেখে আকৃষ্ট হয়। তামিল কৃষকরা এই এলাকাকে উর্বর করে তুলেছিল। তেলেগু যোদ্ধারা এইসব এলাকা দখল করলেও সমভূমির উত্তর দিকের তামিল নেতাদের উৎখাত করেনি এবং বহুক্ষেত্রে তাদের জমির উপর অধিকারও মেনে নিয়েছিল।

সমকালীন স্থানীয় লেখমালা এবং বিদেশী এবং বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ থেকে বিজয়নগরে দুর্গ ও দুর্গাধিপতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার স্বীকৃতি পাওয়া যায়। সমকালীন তেলেগু কবিতায় দেখানো হয়েছে যে, বিজয়নগরের শ্রেষ্ঠ রাজা কৃষ্ণদেব রায় ও দুর্গ, ব্রাহ্মণ সামরিক নেতা ও বিচ্ছিন্নগোষ্ঠীর মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে রাষ্ট্রশক্তি বৃদ্ধির কথা বলেছেন। চোলদের আমলে প্রচলিত ব্যবস্থারই সম্প্রসারিত ও পরিবর্তিত প্রথা হিসাবে সামরিক নেতৃত্বের কাজে ব্রাহ্মণদের উত্থান ঘটে। চোলযুগে নাত্তারের মাধ্যমে ব্রাহ্মণদের জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হত। বিজয়নগরের আমলে ব্রাহ্মণরা সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রণ বাড়ানোর প্রচেষ্টা করেন। এঁদের সরাসরি দূর্গের অধ্যক্ষ নিয়োগ করে সামরিক নেতৃত্বের অংশীদারে পরিণত করা হয়। স্থানীয় ব্রাহ্মণদের পাশাপাশি মহারাষ্ট্র অঞ্চল থেকেও বহু ব্রাহ্মণ এসে সামরিক নেতৃত্বের কাজে লিপ্ত হন।

ডঃ স্টেইনের মতে বিজয়নগরের অধীনস্থ এক সামন্তের সঙ্গে পরবর্তীকালে মুঘল জমিদারের চরিত্রগত পার্থক্য বিশেষ ছিল না। উভয় ক্ষেত্রেই উর্দ্ধতন শাসক গ্রামীণ উৎপাদনের উদ্বৃত্ত আদায় করে নিত। বিজয়নগরের সামরিক ভিত্তির ফলে নিয়মিত উদ্বৃত্ত যোগান দেওয়া ছিল প্রধান কাজ এবং এই ব্যবস্থা চালু রাখার জন্য উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের সাথে সাধারণ কৃষকদের এক নিয়মিত যোগাযোগ বজায় ছিল।

বিজয়নগরের এই রাজনৈতিক ও সামরিক ব্যবস্থা সে দেশের কৃষি সম্পর্কের উপরেও প্রভাব ফেলে। প্রধানত, জমির উপর নিয়ন্ত্রণের চরিত্র থেকেই সাধারণ কৃষক, রাজা ও সামরিক নায়কদের ক্ষমতার ভিত্তি ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতা কর্তৃত্বের সম্পর্ক বিকশিত হয়। ঐতিহাসিক বেঙ্কটরামনাইয়া প্রমুখ কেউ কেউ মনে করেন যে, বিজয়নগর সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা দক্ষিণ ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতির লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি। এই প্রসঙ্গে তাঁরা পূর্ব মারিয়াদে বা প্রাচীন রীতি অনুসরণ করার বিষয়টি উল্লেখ করেন। মুসলমান অগ্রগতির মুখে হিন্দু ধর্মের ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রাখার জন্য দক্ষিণ ভারতে প্রাচীন রীতিনীতিকে কঠোরভাবে আঁকড়ে থাকার প্রবণতা ছিল বলে এরা মনে করেন। পণ্ডিত নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী এই আদর্শবাদের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়েও বিজয়নগরের আমলে পরিবর্তনের দিকটি উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, চোল আমলে জনপ্রিয় 'সভা', 'উর' বা 'নাড়ু' ইত্যাদির অস্তিত্ব বিজয়নগরের আমলে শিথিল হতে থাকে এবং কালক্রমে প্রায় বিলোপ ঘটে। পণ্ডিত কৃষ্ণস্বামীর মতে, বিজয়নগর রাষ্ট্রের সামরিক সংস্থা ও সামন্ততান্ত্রিক পদ্ধতি থেকে উদ্ভূত অবহেলার ফলে পূর্বেকার স্থানীয় সংগঠনগুলি অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। এই পুরানো প্রথাগুলির স্থান নিয়েছিল 'নায়ঙ্কারা' ও 'আয়গার' প্রথা, তাঁর মতে, বিজয়নগর সাম্রাজ্যের অধীনে আসার পর তামিল দেশে 'আয়গার' প্রথার আবির্ভাব ঘটে। এই প্রথার মাধ্যমে গ্রামীণ কর্মচারীদের জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হত। অধ্যাপক অনিরুদ্ধ রায়ের মতে 'নাত্তার' নামক গ্রামীণ কর্মচারী পদের বিলোপ এবং 'নায়ক' পদের উত্থান একান্তই স্থানীয় পরিবর্তন হিসাবে আবির্ভূত হয়। এই নতুন নেতা হিসাবে সম্পূর্ণ অচেনা ব্যক্তির উত্থানও ঘটে। এইভাবে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের আমলে প্রচলিত দক্ষিণ ভারতীয় রীতি এবং গোষ্ঠী, নেতা ও গ্রামের সম্পর্কের মধ্যে পরিবর্তন ঘটে। এর পরিণামে ভূমি ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটে যায়।

নায়ঙ্কারা প্রথার উদ্ভবের সাথে সাথে বিজয়নগর রাজ্যের রাষ্ট্রনৈতিক চরিত্র এবং সামন্ততন্ত্রের সাথে এই প্রথার সামঞ্জস্যের বিষয়টি ঐতিহাসিক বিতর্কের কেন্দ্রে চলে এসেছে। অধ্যাপক রায়-এর

মতে বিজয়নগরের 'নায়ক' প্রথাকে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার সাথে একীভূত করা সঠিক নয়। কেবল সামরিক সাহায্যের বিনিময়ে জমি ভোগ করার অধিকার থাকলে নায়ঙ্কারা প্রথাকে সামন্ত্রতান্ত্রিক প্রথার কাছাকাছি বলা যেত। কিন্তু বিজয়নগরের 'নায়ক' এমন একজন যোদ্ধা যে রাজ্যের সামরিক ব্যবস্থার অঙ্গ এবং যে সবসময় তার নিজের অধিকার একজন জমিদার স্থানীয়। পণ্ডিত নীলকণ্ঠ শাস্ত্রীও মনে করেন যে নায়ক ব্যবস্থা তথাকথিত সামন্ত্রতান্ত্রিক ব্যবস্থার সমতুল্য ছিল না ; পরন্তু বিজয়নগর রাজ্য ছিল আমলাতান্ত্রিক এবং বহুলাংশে কেন্দ্রীকরণ প্রবণতা সম্পন্ন। পর্যটক নুনিজ প্রায় ২০০ জন নায়কের সন্ধান পেয়েছেন এবং তিনি এমন কোন ইঙ্গিত দেননি যে বিজয়নগর বিকেন্দ্রীভূত প্রশাসনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিল।

বার্টন স্টেইন 'Cambridge Economic History of India' গ্রন্থে প্রকাশিত প্রবন্ধে লিখেছেন মধ্যযুগীয় দক্ষিণ ভারতীয় রাজনীতি অনুসারে বিজয়নগর রাজ্যও ছিল একাধিক অংশের সমন্বয় বা Segmentary State। বিজয়নগরকে একটি বৃহত্তর এলাকা বা Macro-region হিসাবে চিহ্নিত করলেও, বিজয়নগরের রাজা কার্যত একটি ছোট্ট এলাকা বা micro-region'-কে প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করতেন। রাজ্যের অবশিষ্ট অংশের আঞ্চলিক শাসকরা (নায়ক) রাজার প্রতি আনুগত্য দেখালেও প্রায় স্বাধীনভাবে শাসন পরিচালনা করতেন। এই খণ্ডিত অংশগুলি সম্মিলিতভাবে বিজয়নগরের সামগ্রিক রাজ্য সৃষ্টি করেছিল।

তেলেগু ও কন্নড়ভাষীরা যে বিজিত এলাকাগুলিতে গিয়ে পূর্বতন অধিবীসদের উৎখাত করেছিল, সে তথ্য পাওয়া যায় না। তারা সাধারণভাবে 'আয়গার' ব্যবস্থার মাধ্যমে বিজিতদের শ্রমকে কাজে লাগায় এবং যাবতীয় উদ্বৃত্ত কেন্দ্রে পাঠায়। এইসব অঞ্চলে নতুন নতুন বসতি গড়ে ওঠে এবং হাট-বাজার স্থাপিত হয়। এ প্রসঙ্গে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল মন্দির। নায়করা একই সঙ্গে স্থানীয় প্রশাসন এবং অধিবাসীদের প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে মন্দিরগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করত। মন্দিরের ভাণ্ডার থেকে শুরু করে পুরোহিত ও ভক্তমণ্ডলীর উপর তাদের প্রভাব দৃঢ় হয়। এমনকি, মন্দিরের সঙ্গে সংযুক্ত গ্রামগুলিতে জল সরবরাহের ব্যবস্থাও তারাই নিয়ন্ত্রণ করত। এ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে ডঃ নোবুই কারাশিমা বলেছেন যে সবকিছুই করা হচ্ছিল অধিক পরিমাণে রাজস্ব, মন্দিরের প্রণামী ও অন্যান্য সব উদ্বৃত্ত কেন্দ্রে পাঠানোর উদ্দেশ্যে এবং নায়কদের পেট ভরানোর

কাজে। এভাবে গড়ে ওঠা গ্রামগুলির শ্রেণিবিন্যাস করা হয়। যেমন, (১) 'ভাণ্ডারবড়া' অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চল যেগুলি স্থানীয় কেল্লার রসদ যোগাত ; (২) নিষ্কর 'মান্য' গ্রাম যেগুলি দেবস্থান ও ব্রাহ্মণ প্রভৃতির রসদ যোগাত, (৩) 'অন্যরম' এলাকা, যেগুলি নায়কদের হাতে ছিল।

এভাবেই জমির স্বত্ব হস্তান্তরিত না করে জমির উৎপাদনের স্বত্ত্ব হস্তান্তরিত হয়েছিল। মোটামুটি একই কাঠামো মুঘল রাজত্বে ভারতে দেখা যায়। ঐতিহাসিকগণ এ বিষয়ে একমত যে গ্রামীণ উৎপাদনের বিভিন্ন স্তর বিভাজন ঘটিয়ে শাসকশ্রেণির জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা স্থায়ী করা হয়েছিল।

অবশ্য উদ্বৃত্ত বণ্টনের কাঠামো সম্পর্কে লিখতে গিয়ে ডঃ এ. কৃষ্ণস্বামী মান্যকে গ্রামীণ আয়গার শ্রেণির ভরণ-পোষণের একক হিসাবে গণ্য করেছেন। আয়গার বলতে প্রশাসনিক কর্মচারীকেই আর বোঝাল না। ধীরে ধীরে এই শ্রেণির মধ্যে এমন কিছু শ্রমজীবীকে অন্তর্ভূক্ত করা হয় যারা পরোক্ষ কৃষিকাজের জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। যেমন কামার, সেচের জল যোগানের শ্রমিক, সেচের ভিস্তি নির্মাতা ইত্যাদি। একইভাবে বহু শৈব ও বৈষ্ণব ধর্মগুরুকেও মান্য বণ্টন করা হয়েছিল যারা ব্রাহ্মণ ছিল না। ডঃ স্টেইনের হিসাব অনুসারে ১৪৫০ থেকে ১৬৫০ সালের মধ্যে মন্দির নির্মাণের সংখ্যা বৃদ্ধির একটা প্রধান কারণ ছিল নির্বিচারে মান্য বণ্টন। বলাই বাহুল্য মন্দির ও ব্রাহ্মণকে বিজয়নগর নিজের সাম্রাজ্যের স্বার্থে বিশেষভাবে কাজে লাগিয়েছিল। এইভাবে ভূমি বণ্টনের ফলে উৎপাদন যেমন বৃদ্ধি পেয়েছিল তেমনি পরগাছা শ্রেণির পালনও সম্ভব হয়েছিল। আবার যথেচ্ছ মন্দির নির্মাণের মধ্যে দিয়ে শ্রমিক ও কারিগর শ্রেণির পালনও সম্ভব হয়।

ডঃ বার্টন স্টেইনের মতে নায়কদের হাতে জমির কেন্দ্রীকরণ ঘটলেও, বিজয়নগরের ব্যবস্থাকে, ইয়োরোপীয় সামন্ততন্ত্রের সমতুল্য বলা চলে না। বিজয়নগরের পঁচাত্তর শতাংশ জমি বিভিন্ন নায়কদের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে ছিল। এই ব্যবস্থা জাপানের সামন্ততন্ত্রের কিছুটা কাছাকাছি। তবে এক্ষেত্রেও স্পষ্ট প্রভেদ লক্ষণীয়। নায়কদের মতই জাপানের সামন্তরা (দাইমিও) সামরিক নেতা ছিলেন ; কিন্তু তাঁদের উপরে ও নীচে অনেকগুলি আর্থ-সামাজিক স্তর বিন্যাস ছিল। অন্যদিকে বিজয়নগরের নায়করা প্রত্যক্ষভাবে জমি নিয়ন্ত্রণ করতেন এবং এখানে কোন স্বীকৃত মধ্যবর্তীর অস্তিত্ব ছিল না। এই বিচারে বিজয়নগরকে একটি 'যুদ্ধরাষ্ট্র' বলা যায়, সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র নয়।

১.৭ বিদেশী পর্যটকদের দৃষ্টিতে বিজয়নগরের অর্থনীতি

বিদেশী পর্যকদের বিবরণী থেকে বিজয়নগরের ঐশ্বর্য, চাকচিক্য এবং জনসাধারণের আর্থিক প্রাচুর্যের আভাস পাওয়া যায়। এঁদের বর্ণনায় বিজয়নগর ছিল সমকালীন বিশ্বের অন্যতম সম্পদশালী রাজ্য। বিজয়নগরের বর্ণনা প্রসঙ্গে নিকলো কন্টি বলেছেন ঃ "শহরের পরিধি ছিল ৬০ মাইল ; এর দেওয়ালগুলি দূরের পাহাড়ঘেরা উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই শহরে প্রায় ৯০ হাজার অস্ত্রধারণে সক্ষম পুরুষ বাস করত। ভারতের যেকোন রাজার থেকে এখানকার রাজা ছিলেন অধিক শক্তিশালী। পারসিক দূত আবদুর রজ্জাক লিখেছেন ঃ "দেশটি এতই জনবহুল যে, তার প্রকৃত চিত্র লিখে বোঝানো কষ্টকর। রাজার কোষাগারে একাধিক প্রকোষ্ঠ আছে, যার প্রতিটি তরল সোনায় পরিপূর্ণ। রাজ্যের সমস্ত উচ্চ-নীচ, এমনকি বাজারের কারিগররাও, দেহের নানা অঙ্গে অলংকারাদি পরিধান করে।" পতুর্গীজ পর্যটক ডোমিনিগো পায়েজ বিজয়নগরকে বিশ্বের সেরা শহর হিসাবে চিহ্নিত করে এখানকার সমৃদ্ধ বাণিজ্যের উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ "এখানকার উন্নত বহির্বাণিজ্যের কারণে বিশ্বের নানা দেশের লোকের সন্ধান পাওয়া যায়। বাজারগুলিতে নানা ধরনের সামগ্রী, ধান, চাল, ডাল, গম, বার্লি প্রভৃতি মজুত থাকত। খাদ্যদ্রব্যের দাম খুবই সস্তা।" পায়েজ বিজয়নগরের রাজার অপরিমেয় ঐশ্বর্য ও হাতি, ঘোড়া সহ বিশাল সেনাবাহিনীর কথাও উল্লেখ করেছেন। এডোয়ার্ডো বারবোসা ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দে এদেশে আসেন। তিনিও বিজয়নগর রাজ্যের আর্থিক প্রাচুর্য ও বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ "নগরটি ছিল সুবিস্তৃত, জনবহুল এবং বাণিজ্যে অগ্রণী। পেগুর সাথে হীরা, রুবি, চীন ও আলেকজান্দ্রিয়ার সাথে সিল্ক এবং মালাবারের সাথে চন্দনকাঠ, কর্পূর ও নানা ধরনের মসলার বাণিজ্য চলত।"

বিদেশী পর্যটকদের প্রায় সকলেই একমত যে, বিজয়নগর রাজ্যের লক্ষণীয় আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিল। সমস্ত মানুষের আয়ব্যয় হয়তো সমান ছিল না ; উচ্চবিত্তের পাশে নিম্নবিত্তের মানুষ অনেক ছিল ; কিন্তু সাধারণভাবে যাকে দারিদ্র্যের যন্ত্রণা বলে, তা বিজয়নগরের কোন মানুষকেই ভোগ করতে হত না। দেশের এই সমৃদ্ধির প্রধান উৎস ছিল কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের অগ্রগতি। কৃষিক্ষেত্রে বিজয়নগর ছিল খুবই উন্নত। পায়েজ লিখেছেন ঃ "এদেশে প্রচুর ধান ও অন্যান্য শস্য, শিম-জাতীয় ফসল এবং আমাদের দেশে হয় না এমন সব শস্য উৎপন্ন হয় ; কার্পাসের প্রচুর চাষ হয়। এদেশে অসংখ্য গ্রাম, শহর ও বড় বড় নগর আছে। কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে রাজাদের সজাগ দৃষ্টি আছে। বেশি সংখ্যক জমিকে সেচের আওতায় আনার জন্য এবং অনাবাদী জমিকে চাষযোগ্য করে তোলার জন্য সরকার

তরফে নানা ব্যবস্থা গৃহীত হয়। সরকারি আয়ের প্রধান উৎস ছিল ভূমি-রাজস্ব। সাধারণভাবে উৎপন্ন ফসলের একষষ্ঠাংশ ভূমি-রাজস্ব হিসাবে আদায় করা হত। তবে দেশের প্রয়োজনে রাজস্বের হার বৃদ্ধি করা হত। অবশ্য শস্যভেদে, মৃত্তিকাভেদে এবং সেচভুক্ত ও অসেচভুক্ত এলাকায় রাজস্বের হারে তারতম্য ছিল। যেমন—একটি শিলালিপি থেকে জানা যায়, 'শীতকালে কুরুভয়ি (ধান) উৎপন্নের এক-তৃতীয়াংশ, তিল, রাগী, ছোলা, ইত্যাদির এক-চতুর্থাংশ ; জোয়ার ও শুকনো জমির উৎপন্নের এক-ষষ্ঠাংশ রাজস্ব দিতে হত। ভূমি-রাজস্ব ছাড়াও প্রজাদের সম্পদ-কর, বিক্রয়-কর, যুদ্ধ-কর, বিবাহ-কর ইত্যাদি নানা ধরনের অতিরিক্ত কর দিতে হত।" ষোড়শ শতকে আগত রুশ পর্যটক আলেকজাণ্ডার নিকিতিন লিখেছেন ঃ "রাজ্যে বহু লোকের বাস ছিল। পল্লী অঞ্চলের লোকদের অবস্থা ছিল শোচনীয় কিন্তু অভিজাতরা ছিলেন অতি সমৃদ্ধিশালী এবং বিলাসব্যসনে মত্ত।" ডঃ সতীশচন্দ্র মনে করেন যে, বিদেশী পর্যটকগণ বিজয়নগরের কৃষকদের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে এক ধরনের কথা বলেননি। তার প্রধান কারণ হ'ল অধিকাংশ পর্যটক গ্রামীণ জীবনযাত্রা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে বস্ত্র শিল্প, খনি শিল্প ও ধাতু ছিল প্রধান। এছাড়া সুগন্ধ দ্রব্য উৎপাদনে বিজয়নগরের খ্যাতি ছিল।

বিজয়নগরের আর্থিক সমৃদ্ধির মূলে কৃষির পরেই ছিল বাণিজ্যের স্থান। অভ্যন্তরীণ ও বাহির্বাণিজ্য উভয় ক্ষেত্রেই বিজয়নগর ছিল একটি অগ্রণী দেশ। সারাদেশে একাধিক ব্যস্ত বন্দর ছিল। আবদুর রজ্জাক এখানে তিনশো বন্দরের উল্লেখ করেছেন। মালাবার উপকূলে এ যুগের ব্যস্ততম বন্দর ছিল কালিকট। পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, ব্রহ্মদেশ, মালয় উপদ্বীপ, চীন, আরব, পারস্য, দক্ষিণ আফ্রিকা, আবিসিনিয়া, পর্তুগাল, প্রভৃতি দেশের সাথে বিজয়নগরের বহির্বাণিজ্য চলত। প্রধান রপ্তানি দ্রব্যাদির মধ্যে ছিল নানাধরনের বস্ত্র, সুগন্ধি মসলা, চাল, চিনি, সোরা, লোহা ইত্যাদি। বিদেশ থেকে আমদানি হত প্রধানত ঘোড়া, হাতি, তামা, কয়লা, পারদ প্রবাল, ভেলভেট ইত্যাদি। অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যও যথেষ্ট সমৃদ্ধ ছিল। স্থলপথে ও জলপথে অন্তর্দেশীয় বাণিজ্য চলত। স্থলপথে ঘোড়া বলদ ও গো-শকটে মাল পরিবহণ হত। সমুদ্রের উপকূলবর্তী বন্দরগুলিকেও অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যে ব্যবহার করা হত। উপকূলের বাণিজ্যে ছোট ছোট জলযান ব্যবহৃত হত। তবে বিজনগরে বড় জাহাজও তৈরী হত। বারবোসা দক্ষিণ ভারতের মালদ্বীপে বড় জাহাজ তৈরীর কারখানা ছিল বলে উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া, রাজাদের উৎকীর্ণ কিছু লিপি থেকেও অনুমান করা হয় যে, জাহাজ নির্মাণশিল্প সেকালে অজানা ছিল না। পর্তুগীজ বণিকদের সাথে বিজয়নগরের সুসম্পর্কের প্রেক্ষিতে ধারণা করা যায় যে, জাহাজশিল্প ও জাহাজের ব্যবহার সম্পর্কে বিজয়নগরের অধিবাসীরা যথেষ্ট অভিজ্ঞ ছিল। অবশ্য অনেকের অভিযোগ

এই যে, প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে দক্ষ নৌবাহিনী গড়ার ব্যাপারে বিজয়নগরের শাসকরা যথেষ্ট উদাসীন ছিলেন।

এ যুগে শিল্প ও বাণিজ্যে 'গিল্ড' বা বণিকসংঘের বিশেষ গুরুত্ব ছিল। একই ধরনের শিল্প বা ব্যবসা শহরে নির্দিষ্ট স্থানে গড়ে ওঠার প্রবণতা ছিল। আবদুর রজ্জাক লিখেছেন ঃ "এক-এক ধরনের শিল্প বা ব্যবসার জন্য এক-একটি স্বতন্ত্র গিল্ড বা সংঘ গড়ে উঠত। গিল্ডের তত্ত্বাবধানে এই ব্যবসা শহরের নির্দিষ্ট অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত হত। পায়েজের বর্ণনাতেও ব্যবসায়ী সংঘ এবং কেন্দ্রীভূত বাণিজ্যকেন্দ্র গড়ে ওঠার কথাও পাওয়া যায়।

বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে বিজয়নগরে মুদ্রার প্রচলন ছিল। সোনা ও তামার মুদ্রার প্রচলন ছিল বেশি। সামান্য পরিমাণ রৌপ্য মুদ্রাও প্রচলিত ছিল। মুদ্রাগুলির গায়ে নানা ধরনের কারুকার্য করা থাকত। মুদ্রাতে দেব-দেবীর মূর্তি ও পশু-পাখির ছবি খোদিত থাকত। সাধারণত উচ্চ ও মধ্য শ্রেণিভুক্ত লোকেদের আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিল এবং এঁরা বিলাসব্যসনে জীবন অতিবাহিত করতে অভ্যস্ত ছিলেন। তবে দেশের সাধারণ মানুষ ছিলেন গরীব। অবশ্য নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে বা জীবনধারণের ন্যূনতম সংস্থানের অভাব কারো ক্ষেত্রে ছিল না। বিজয়নগরের আর্থিক ব্যবস্থার অন্যতম ত্রুটি হ'ল এই যে, করভারের বোঝাটা মূলত নিম্নবিত্ত সাধারণ মানুষকেই বহন করতে হত। অবশ্য বিজয়নগরের সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থা বাহমনী রাজ্যের থেকে অনেক বেশি সুস্থ ও সমৃদ্ধ ছিল।

১.৮ সংক্ষিপ্তসার

দাক্ষিণাত্যে সুলতানী শাসনের ভাঙনের কালে উদ্ভূত স্বাধীন রাজ্যগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল বিজয়নগর। রাজনীতি, অর্থনীতি, প্রশাসন, সংস্কৃতি সকল ক্ষেত্রেই বিজয়নগর সাম্রাজ্যের ইতিহাস ভারত ইতিহাসের এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায় হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিজয়নগর শুধু সমকালীন ভারতেই নয় সমকালীন বিশ্বেও এক বিস্ময়স্বরূপ ছিল। সামরিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক এক আর্থ-প্রশাসনিক ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে বিজয়নগর এক সুসংগঠিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, মুদ্রাব্যবস্থা প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই বিজয়নগরের সেই উৎকর্ষের সাক্ষ্য পাওয়া যায়। বিদেশী পর্যটকরা তাঁদের ভ্রমণ বৃত্তান্তে বিজয়নগর সম্পর্কে যে তথ্যাবলী লিপিবদ্ধ ও মন্তব্য করেছেন সেখানেও এই সমৃদ্ধির ভূয়সী প্রশংসা লক্ষ্য করা যায়।

১.৯ অনুশীলনী

রচনাধর্মী প্রশ্নাবলী ঃ

১। বিজয়নগর রাজ্যের অর্থব্যবস্থার প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা কর।

২। বিদেশী পর্যকদের দৃষ্টিতে বিজয়নগর রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থার পর্যালোচনা কর।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী ঃ

১। নায়ঙ্কারা প্রথা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।

২। বিজয়নগর রাজ্যের কর ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা কর।

১.১০ গ্রন্থপঞ্জী

১। The Cambridge Economic History of India, Vol—1
—Tapan Roychowdhury and Irfan Habib (ed.)

২। Vijaynagara—Burton Stein.

৩। A History of South India—K. A. Nilkantha Shastri.

৪। সুলতানী আমলে ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস—অনিরুদ্ধ রায়।

———————

একক ২ বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা (৫০০-১৩০০ খ্রীষ্টাব্দ) ও বাহমনী রাজ্যের অর্থনীতি

গঠন

২.১ প্রস্তাবনা

২.২ ভূমি ব্যবস্থা সম্পর্কিত তাম্রশাসন

২.৩ অগ্রহার ব্যবস্থা

২.৪ সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব

২.৫ কৃষি ব্যবস্থা

২.৬ শিল্প ব্যবস্থা

২.৭ ব্যবসা-বাণিজ্য

২.৮ মুদ্রা ব্যবস্থা

২.৯ নগরায়ণ ব্যবস্থা

২.১০ বাহমনী রাজ্যের অর্থনীতি

২.১১ উপসংহার

২.১২ অনুশীলনী

২.১৩ গ্রন্থপঞ্জি

২.১ প্রস্তাবনা

গুপ্ত সাম্রাজ্যকে উত্তর ভারতের শেষ সংগঠিত ব্যবস্থা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। উত্তর ভারতে গুপ্তদের পতনের পর একাধিক রাজবংশের নেতৃত্বে আঞ্চলিক রাজ্য প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু হয়। আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ও ইতিহাসের ওপর ভিত্তি করে এই অঞ্চলগুলির অধিবাসীদের একটি আঞ্চলিক ব্যবস্থা গড়ে

উঠেছিল। কেন্দ্রের প্রতি আনুগত্য বা নির্ভরতার পরিবর্তে সম্পূর্ণ স্থানীয় প্রয়োজন, আঞ্চলিক অর্থনীতি ও সংস্কৃতির উপর গুরুত্ব আরোপিত হল। সেইরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক রাজ্য হিসাবে বাংলার উদ্ভব ও তার নতুন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কাঠামো ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ঐতিহাসিকেরা বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করেছেন। তাদের মতে এই সময়কে খুব সহজে ব্যাখ্যা করা যায় না এবং আঞ্চলিক রাজ্য হিসাবে এইযুগে বাংলার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অগ্রসরণের ধারা ছিল পূর্ববর্তীকাল অপেক্ষা জটিল। এই এককের লক্ষ্য হল ৫০০-১৩০০ খ্রীষ্টাব্দ সময়কালে আদি মধ্যযুগের বাংলার অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য ও গতিধারা সম্বন্ধে আলোচনা করা এবং এর সঙ্গে ত্রয়োদশ শতকে দক্ষিণের বাহমনী রাজ্যের আর্থিক অবস্থার দিকেও আমরা দৃষ্টিপাত করব।

২.২ ভূমি ব্যবস্থা সম্পর্কিত তাম্রশাসন

কৃষি প্রধান সভ্যতায় ভূমি ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে গ্রামের সংস্থান, শ্রেণি বিন্যাস, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির পারস্পরিক সম্বন্ধ, বিভিন্ন প্রকারের ভূমির তারতম্য অনুসারে ভূমির উপর অধিকার ইত্যাদি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ভূমি হস্তান্তরের বৃত্তান্ত জানার ক্ষেত্রে প্রধান উপাদান হল অংসখ্য তাম্রশাসন। তামার ফলকে রাজকীয় 'শাসন' হিসাবে ভূমি হস্তান্তরের ঘটনাগুলি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এই তাম্রশাসন থেকে দাতা ও দানগ্রহীতার নাম, প্রদত্ত জমির বিবরণ, দানের উপলক্ষ ও উদ্দেশ্য ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে জানা যায়। ভূমি ব্যবস্থা সম্পর্কিত যে সব পট্টোলী বা তাম্রশাসন প্রাচীন বাংলায় পাওয়া গেছে, ঐতিহাসিক নীহারঞ্জন রায়ের মতে সেগুলিকে মোটামুটি দুইভাগে ভাগ করা যায়। খ্রীষ্টোত্তর পঞ্চম থেকে অষ্টম শতক পর্যন্ত লিপিগুলি ভূমিদান বিক্রয় সম্বন্ধীয়, সেখানে ভূমি বিক্রয় এবং দান সম্বন্ধে আলোচিত হয়েছে। এই লেখগুলিতে ভূমি সম্পর্কিত দায় ও অধিকার, ভূমির প্রকারভেদ ইত্যাদি তথ্যগুলি পাওয়া যায়। কিন্তু অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত প্রাপ্ত ভূমিদান লিপিগুলির সব কয়টিই ভূমিদানের শাসন, একটিও ভূমি ক্রয় বিক্রয়ের শাসন নয়। পূর্বের তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে ভূমি ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তি রাজ্যসরকারের কাছে ভূমি ক্রয়ের জন্য আবেদন করছেন। তিনি প্রচলিত রীতি অনুযায়ী ভূমির মূল্য দেবেন এবং সর্বত্রই ভূমি ক্রয়ের মূল উদ্দেশ্য হল ক্রীতভূমি দেবকার্য বা ধর্মাচারণোদ্দেশ্যে দানের ইচ্ছা। ভূমির মূল্যের উপর ক্রেতাকে রাজসরকারকে একটি কর দেওয়াই ছিল প্রথা। কিন্তু যেহেতু ক্রীত ভূমিখণ্ডগুলি প্রায় সমস্তই ধর্ম্যচারণের উদ্দেশ্যে দানের জন্য, সেহেতু এগুলি করমুক্ত। ভূমি বিক্রয়ের

সমস্ত ঘটনাটি প্রায় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সামনেই সম্পন্ন করা হত। কিন্তু অষ্টম শতকের ভূমিদানের তাম্রশাসনগুলির চরিত্র একটু ভিন্ন ধরনের। এখানে কোন ক্রেতা বা বিক্রেতার উল্লেখ নেই। রাজা স্বেচ্ছায় ভূমিদান করছেন গ্রহীতাকে। পাল আমলে দেখা যায় যে, ভূমি দান করা হচ্ছে ব্রাহ্মণ বা ধর্মপ্রতিষ্ঠানকে ধর্মানুষ্ঠান পালনের জন্যে।

২.৩ অগ্রহার ব্যবস্থা

প্রায় সমগ্র গুপ্ত আমল জুড়ে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে বৈশিষ্ট্যটি সমকালের আর্থসামাজিক জীবনকে প্রভাবিত করার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের সমাজ ও অর্থনীতির উপর সুদূর প্রসারী ফল বিস্তার করেছিল তা অগ্রহার ব্যবস্থা নামে পরিচিত। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতক থেকে ব্রাহ্মণ বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে ধর্মীয় উদ্দেশ্যে জমিদান প্রথা প্রচলিত হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অনাবাদী পতিত জমি দান করা হত। প্রাচীন বাংলার গুপ্তকালীন তাম্রশাসনগুলি প্রকৃতপক্ষে জমি বিক্রয়ের দলিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভূখণ্ড ক্রয় করার পর তা কোন ব্রাহ্মণ, দেবমন্দির বা বৌদ্ধবিহারে দান করা হত। দানগুলি ছিল নিষ্কর, চিরকালীন এবং অনবসিত জমি দানের শর্তে দেওয়া হত। যেখানে অন্যান্য রাজ্যে চাষাবাদ জমি দানগ্রহীতাকে হস্তান্তর করা হত, সেখানে বাংলায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি পতিত জমি লাভ করতেন এবং জমি দুইবার হস্তান্তরিত হয় (বাজার থেকে ক্রেতা এবং ক্রেতার থেকে দানগ্রহীতা)। যখন একটি ভূখণ্ড দান করা হত, তখন সেই ভূখণ্ডের উপর দানগ্রহীতার মালিকানা স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত হত। কিন্তু গ্রামদান করা হলে গ্রামের পূর্ণ মালিকানা দানগ্রহীতার প্রাপ্য ছিল না, তিনি ঐ গ্রামে থেকে তার নির্দিষ্ট রাজস্ব ভোগ করার অধিকারী হন। ব্রাহ্মণ ছাড়াও বৌদ্ধ বিহারগুলি রাজকীয় অনুগ্রহের দ্বারা ভূ সম্পদ লাভ করত। প্রাচীন বাংলার কুমিল্লা জেলায় আবিষ্কৃত বৈন্যগুপ্তের তাম্রশাসন থেকে এই বিষয়ে বোঝা যায়।

দানগ্রহীতা ভূমি রাজস্ব ছাড়াও ভূমির অন্যান্য সম্পদ ভোগের অধিকারী ছিলেন। ডঃ রাম শরণ শর্মা তাঁর 'Indian Feudalism' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, রাজস্বের অধিকার ছাড়াও রাজা সেই অঞ্চলের প্রশাসনিক ক্ষমতা হস্তান্তর করতেন। দানগ্রহীতা গ্রামীণ আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখতেন এবং রাজস্ব সংগ্রহের জন্য নিজস্ব ও স্বতন্ত্র ব্যবস্থাদি প্রবর্তন করতেন।

ভূম্যধিকারী হিসেবে দানগ্রহীতাদের প্রতাপ, ক্ষমতা ও আর্থিক সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং কৃষকদের ক্রমশই ভূম্যধিকারীর উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়তে হয়েছিল। তাই বলা যেতে পারে যে, অগ্রহার ব্যবস্থার ফলে রাজা ও কৃষকের মধ্যে দানগ্রহীতার রূপে একটি মধ্যবর্তী শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছিল।

অনাবাদী পতিত ভূখণ্ড ছিল রাষ্ট্রের কাছে একটি অর্থনৈতিক দায়স্বরূপ। অধ্যাপক রণবীর চক্রবর্তীর মতে প্রাচীন বাংলায় রাষ্ট্র পতিত জমিগুলিকে দান করার মাধ্যমে সেগুলিকে আবাদী জমিতে পরিণত করতে সচেষ্ট হয়েছিল। আবার পতিত জমি বিক্রির মাধ্যমে রাষ্ট্র তৎক্ষণাৎ নগদ অর্থ লাভ করত। গুপ্ত লেখমালায় যে সব কর পরিহারের কথা বলা হয়েছে, তার মধ্যে ভূমি রাজস্ব সর্বপ্রধান। পাল আমলে ভূমিদান করা হত ধর্মপ্রতিষ্ঠানের জন্য, যদিও ব্যক্তিগতভাবে ব্রাহ্মণকে ভূমিদানের দৃষ্টান্তও দেখা যায়। কিন্তু সেন আমলে প্রায় সব দানই ব্যক্তিগত দান। দানগ্রহীতা হলেন ব্রাহ্মণ এবং দানের উপলক্ষ হচ্ছে কোন ধর্মানুষ্ঠানের আচরণ। গুণাইঘর, লোকনাথ এবং খালিমপুর লেখর সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে, ধর্মপ্রতিষ্ঠানের স্থাপয়িতা ধর্মানুষ্ঠানের জন্য রাজার কাছে ভূমিদানের প্রার্থনা করলে রাজা সেই প্রার্থনা মঞ্জুর করছেন। আর যেখানে রাজা নিজেই প্রতিষ্ঠাতা, সেখানে তিনি স্বেচ্ছায় কোন অনুরোধ ব্যতীতই ভূমিদান করেছেন। অষ্টম শতকের আস্রফপুরলিপি এর সাক্ষ্য বহন করে। রাজা যখন ভূমি বিক্রয় করেন এবং সেই জমিকে "সমুদয়-বাহ্যাপ্রতিকর" বা সকল প্রকার রাজস্ব বিবর্জিত করেন, তখন তিনি দানের পুণ্যের এক ষষ্ঠ ভাগের অধিকারী হন, কারণ সেই জমি থেকে যে রাজস্বের এক ষষ্ঠ ভাগের তিনি অধিকারী হতে পারতেন, তা তিনি পরিত্যাগ করছেন এবং ফলস্বরূপ তিনি দানের পুণ্যের এক ষষ্ঠ ভাগের অধিকারীতে পরিণত হন।

অষ্টম শতক পূর্ববর্তী লিপিগুলিতে তিন প্রকার ভূমির উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা, বাস্তু, ক্ষেত্র ও খিলক্ষেত্র। ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় তাঁর 'বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব' গ্রন্থে এই জমিগুলির বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করেছেন। বসবাসের যোগ্য জমিকে বাস্তু জমি বলা হয়ে থাকে। যে ভূমি কর্ষণযোগ্য এবং সেই জমিতে চাষ আবাদ করা হচ্ছে, তা ক্ষেত্র ভূমি। কিন্তু যে ভূমি কর্ষণযোগ্য অথচ অকর্ষিত রয়ে গেছে, সেই ক্ষেত্রকে খিলক্ষেত্র বলা হয়ে থাকে। জমি নিয়মিত চাষের ফলে ভূমির উর্বরতা নষ্ট হয়ে গেলে সে ভূমিকে অনেক সময় দু-চার বছর ফেলে রাখলে তার উর্বরতা বৃদ্ধি পায় এবং চাষ করা হয়। আর যে সকল জমি কর্ষণের অযোগ্য, তাকে শুধু খিল বা পতিত জমি বলা হয়ে থাকে। পঞ্চম থেকে সপ্তম শতক পর্যন্ত প্রাচীন বাংলার লিপিগুলিতে ভূমি মাপের যে মাপকাঠি ব্যবহৃত হত, সেইগুলি

হল—কুলা বা কুল্যবাপ, দ্রোণ বা দ্রোণবাপ এবং সর্বনিম্ন মাপ আঢ়বাপ। কুল্য, দ্রোণ ও আঢ় সমস্তই ছিল শস্যমান। তাম্রশাসনগুলি যেহেতু বিক্রয় ও দানের মাধ্যমে জমি হস্তান্তরের ঘটনার সাক্ষ্য দেয়, ফলে এই জাতীয় তথ্যসূত্রে জমির মাপ নেবার পদ্ধতির কথাও বলা হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রাচীন বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পাওয়া বারোটি তাম্রশাসনের সাক্ষ্য বিশেষ মূল্যবান। এই তাম্রশাসনগুলি মূলতঃ পুণ্ডবর্ধনভুক্তি বা উত্তরবঙ্গ এলাকায় (গুপ্ত শাসকদের সময়) এবং বঙ্গ অঞ্চলে অর্থাৎ ঢাকা-বিক্রমপুর, ফরিদপুর (গুপ্ত শাসনের অব্যবহিত পরবর্তী আমলে) অঞ্চলে পাওয়া গেছে।

'বাপ' কথাটি বীজ বপনের সঙ্গে জড়িত এবং 'কুল্য' পরিমাণ বীজ শস্য যে আয়তনের ভূমিতে বপন করা যায়, সেই পরিমাণ ভূমি এক কুল্যবাপ ভূমি নামে পরিচিত। দ্রোণবাপ এবং আঢ়বাপ ও যথাক্রমে এক দ্রোণ ও এক আঢ় বা আঢ়ক শস্য বপণযোগ্য ভূমি। অনেক ঐতিহাসিক বলে থাকেন যে কুল্য শব্দটি পূর্ববাংলার কুলা শব্দের থেকে এসেছে অর্থাৎ একটি কুলায় যত ধান বা শস্য ধরে তার বীজ যতটা পরিমাণ ভূমিতে বপণ করা হয় তাই কুল্যবাপ। এক কুল্যবাপ ভূমি আট দ্রোণবাপের (দ্রোণ = কলস) সমান এবং এক দ্রোণ বাপ চার আঢ় বাপের সমতুল্য। কুল্য বা দ্রোণ উভয় মাপই ধানের আধার, যেহেতু ধানই বাংলার প্রধানতম শস্য।

হস্তান্তরযোগ্য জমির দানের স্বরূপ জানা যায় বাংলার তাম্রশাসনগুলিতে। পাঁচটি দামোদরপুর তাম্রশাসনে (দুটি কুমারগুপ্তের সময় ৪৪৪-৪৪৮ খ্রীঃ) দুটি বুধগুপ্তের সময়-একটির তারিখ উল্লেখিত নেই ; অপরটি ৪৯৬ খ্রীঃ ; আরেকটি বিষ্ণুগুপ্তের আমলের ৫৪৪ খ্রীঃ, উত্তরবঙ্গে জমির দাম 'কুল্যবাপ' প্রতি তিন স্বর্ণদীনার। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পরবর্তীকালে বঙ্গ অঞ্চলে রাজা ধর্মাদিত্য, সমাচারদের এবং গোপচন্দ্রের রাজত্বকালে জমির দাম প্রতি 'কুল্যবাপে' চার দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) ছিল (রাজা ধর্মাদিত্যের দুটি ফরিদপুর তাম্রশাসন ; রাজা সমাচারদেবের ঘুঘুরাহাটি তাম্রশাসন ও রাজা গোপচন্দ্রের মল্লসারুল তাম্রশাসন)। উত্তরবঙ্গে ও পূর্ববঙ্গে জমির দামের তারতম্য ছিল কারণ উত্তরবঙ্গে হস্তান্তরিত জমি বেশির ভাগই অনাবাদী পতিত জমি কিন্তু বঙ্গের জমি ছিল উর্বর এবং চাষের উপযুক্ত।

সাধারণত তাম্রশাসনের শেষাংশে প্রদত্ত গ্রামের সীমানা বর্ণনা করা হত। পরবর্তী যুগে অর্থাৎ পাল এবং সেন আমলে ভূমির মূল্য সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায় না। তবে বিশ্বরূপসেনের একটি লিপিতে এবং কেশবসেনের ইদিলপুর লিপিতে এই মূল্যের কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই লিপিগুলিতে ভূমির মোট বার্ষিক আয়ের একটি হিসেব পাওয়া যায় এবং এই বার্ষিক আয় থেকে ভূমির মোট মূল্য কী হতে

পারে, তা অনুমান করতে হয়। পাল ও প্রতিহার রাজাদের আমলের তাম্রশাসন পরীক্ষা করে রামশরণ শর্মা বলেছেন যে, বহুক্ষেত্রে প্রদত্ত গ্রামের সীমা সঠিকভাবে বর্ণিত করা হয়নি। দানগ্রহীতা দানে প্রাপ্ত গ্রামের তৃণভূমি এবং চারণভূমিতে কৃষির পত্তন করতেন। তাহলে তিনি সেই উদ্বৃত্ত রাজস্ব ভোগ করতে পারতেন। তাছাড়া কৃষি এলাকার সম্প্রসারণ ঘটিয়ে দানগ্রহীতা আরো বেশি পরিমাণ রাজস্ব সংগ্রহ করতে পারতেন এবং অতিরিক্ত উৎপাদনের কোন অংশ রাজকোষে প্রত্যার্পণ করার বাধ্যবাধকতা তার ছিল না। পাল ও সেন আমলের তাম্রপত্রগুলি থেকে জানা যায় যে, গ্রামদানের সময় গ্রামবাসীরা সেখানে উপস্থিত থাকতেন এবং তাদের কাছে দানগ্রহীতার পরিচয় এবং ভূমিদানের কারণ ব্যাখ্যা করা হত। কিন্তু এটি ছিল আনুষ্ঠানিক একটি প্রথা কারণ রামশরণ শর্মার মতানুযায়ী গ্রামবাসীর মতামতের বা অনুমোদনের প্রয়োজন দাতার ছিল না। গ্রামের উপর সকলের যৌথ অধিকার প্রথা অগ্রহার ব্যবস্থার মাধ্যমে সঙ্কুচিত হয়েছিল এবং ভূস্বামীর অধিকার দৃঢ় হয়েছিল।

অগ্রহার ব্যবস্থার ফলাফল আলোচনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে কৃষি অর্থনীতির বিস্তারে অগ্রহার ব্যবস্থা সহায়ক হয়েছিল। আমরা পূর্বে দেখেছি যে, তাম্রশাসনের মাধ্যমে ভূসম্পদ হস্তান্তরের যে সব নজির পাওয়া গেছে, তার অনেকগুলি অনাবাদী জমিতে অবস্থিত ছিল। প্রাচীন বাংলার তাম্রশাসনগুলিতে বিশেষতঃ প্রাক পাল লেখমালায় ব্রাহ্মণ বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে অনাবাদী জমি হস্তান্তরের উল্লেখ পাওয়া যায়। সপ্তম শতকে প্রাচীন শ্রীহট্টে (বর্তমানে সিলেট, বাংলাদেশে) সামন্ত লোকনাথ যে জমি অগ্রদান হিসেবে ব্রাহ্মণদের দান করেছিলেন, তা অবস্থিত ছিল এক গহন অরণ্যে এবং তাঁর টিপেরা তাম্রশাসন, (৬৬৫ খ্রীঃ) থেকে আমরা এই বিষয়েও অবগত হই যে, সেই অরণ্য হিংস্র শ্বাপদে পরিপূর্ণ। অরণ্যে জমি দান করলে দানগ্রহীতা ছাড়া অন্যান্য ব্যক্তিরাও এসে বসবাস করবেন এবং ব্রাহ্মণ, রীতি অনুযায়ী যেহেতু নিজে চাষবাসের কাজ করবেন না, সেহেতু জমিতে কর্ষক ও নানা বৃত্তিধারী গোষ্ঠীর বসবাসের ব্যবস্থা করা হত এবং ক্রমে একটি জনবসতি সৃষ্টি হত। এইভাবে অগ্রহার ব্যবস্থার মাধ্যমে অনেক অনাবাদী অঞ্চল চাষবাসের যোগ্য করে তোলা হত। পাল ও সেন আমালের লিপিগুলি থেকে বিশেষতঃ সন্ধাকর নন্দী রচিত রামচরিতম্ কাব্য থেকে এই বিষয়টি সুস্পষ্ট যে, এই আমলে লোকবসতি ও কৃষির বিস্তার বৃদ্ধি পেয়েছিল। লোকসংখ্যার বৃদ্ধি, রাজার ধর্মীয় এবং সমৃদ্ধ ব্যক্তিদের ভূমি দান করে সম্মান বৃদ্ধির প্রচেষ্টা, ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের ভূমি সংগ্রহের অভিলাষা গুপ্ত পরবর্তী যুগে বাংলাদেশে ক্রমশঃ বসতি ও কৃষির বিস্তার ঘটিয়েছিল।

২.৪ সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব

অগ্রহার ব্যবস্থা আর্থ-সামাজিক অবস্থাকে কতখানি প্রভাবিত করেছিল তা বিচার করা জরুরী। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী থেকে এইরূপ ভূমিদানের ক্ষেত্রে দুটি বৈশিষ্ট্য প্রকট হয়ে ওঠে—জমির খাজনা আদায় এবং প্রশাসনিক দায়িত্বের হস্তান্তর। জমি দানের সময় রাজা কেবল জমির রাজস্ব ত্যাগ করেননি, জমি থেকে আদায়ীকৃত অন্যান্য আয়ের উৎসও তিনি দানগ্রহীতাকে প্রদান করতেন। তাছাড়া প্রদত্ত গ্রামের অধিবাসীদের শাসনের অধিকারও পরিহার করতেন। গ্রামে অবস্থিত চাষী এবং কারিগরদের আদেশ দেওয়া হয়েছিল যে, তারা দানগ্রহীতাকে শুধু প্রথাগত কর দেবে তাই নয়, তার (দানগ্রহীতার) আদেশও পালন করবে। সরকারী কর্মচারী বা সৈনিকগণের অগ্রহার ক্ষেত্রে প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। অর্থাৎ রাজ্যে প্রশাসনিক ক্ষমতার হস্তান্তর ঘটল এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উভয় ক্ষেত্রেই রাজা এবং প্রজার মধ্যে একদল শক্তিশালী মধ্যবর্তী ভূম্যধিকারী শ্রেণির আবির্ভাব হল। পালদের কয়েকটি অনুদানে গ্রামে রাজপদাধিকারীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই দানগুলিতে গ্রহীতাকে তার অঞ্চলে দণ্ড দেবার অধিকারও প্রদান করা হয়েছে। সমকালীন স্মৃতিকাররা ভূমি ব্যবস্থায় তিনটি স্তরের কথা উল্লেখ করেছেন—'মহীপতি', 'স্বামী' ও 'কর্ষক'। 'মহীপতি' হলেন রাজা, 'স্বামী' হলেন জমির মালিক ও কর্ষক বলতে চাষীদের বোঝানো হয়েছে। ব্রাহ্মণ যেহেতু নিজে চাষ করতেন না, তাই প্রাপ্ত জমি থেকে উৎপাদন জাত আয় ভোগের জন্য কৃষক নিয়োগ করা হত। এইভাবে অগ্রহার ব্যবস্থা বাংলায় ব্রাহ্মণ ও ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলিকে মধ্যবর্তী ভূম্যধিকারী শ্রেণিতে পরিণত করেছিল। ঐতিহাসিক রাম শরণ শর্মার মতে এই ভূমিব্যবস্থায় ভূস্বামীর সুযোগ সুবিধার সঙ্গে প্রকৃত চাষীর সুযোগ সুবিধার ব্যবধান বাড়তে থাকে। ভূস্বামীর অধঃস্তন উপস্বত্বভোগীদের উদ্ভাবনের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

দানগ্রহীতা বা ভূম্যধিকারী উৎপাদন প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করতেন। সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উপায়ে জমির মালিক কৃষকদের থেকে বিভিন্ন ধরনের কর আদায় করতেন। রাজার থেকে প্রাপ্ত সনদ তাকে তার জমির প্রকৃত মালিকে পরিণত করেছিল। এইরূপ ব্যবস্থা কৃষকদের জমিতে ভোক্তার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছিল। গ্রামে যৌথ মালিকানা ব্যবস্থা বিছিন্ন হয় এবং উৎপাদক উপভোক্তার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। কৃষকদের শ্রমের উপর দানগ্রহীতার অধিকার সুদৃঢ় হল। কৃষকদেরর "হালকর", "অর্ধশরিক" ইত্যাদিভাবে অভিহিত করা হল। যা থেকে বোঝা যায় যে, জমি নিয়ন্ত্রণের উপর এদের কোন অধিকার ছিল না। দানগ্রহীতার জমি থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ কর আদায় ছাড়াও অতিরিক্ত কর

তোলার অধিকার ছিল। দানগ্রহীতা জমির কর ছাড়াও বিষ্টি (বেগার শ্রম) ভূমির কর্ষকদের থেকে আদায় করতেন। ফলে কৃষকদের আর্থিক দুর্গতি বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং তাম্রশাসনে কর আদায় ও 'সর্বপীড়া' কথাটি কার্যতঃ সমার্থক ছিল।

ধর্মীয় ছাড়া ধর্মনিরপেক্ষ ভূমিদানের কথাও আমরা জানতে পারি। রাজা অনেক সময় তাঁর অধীনস্থ সামরিক কর্মচারী বা কোন প্রশাসককে একটি বৃহৎ ভূখণ্ডের প্রশাসনিক দায়দায়িত্ব অর্পণ করতেন। সামন্তদের এক একটি এলাকায় স্বাতন্ত্র দেওয়া হত এবং এই এলাকা থেকে প্রাপ্য রাজস্বের একাংশ নিয়ে সামন্তরা নিজের ব্যয় নির্বাহ করতেন। সামন্তব্যবস্থা উদ্ভবের আগে সামরিক এবং অসামরিক পদস্থ কর্মচারীরা রাজার বেতনভোগী ছিলেন। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার ফলে বন্ধ অর্থনীতির উন্মেষ ঘটে, বাণিজ্যের সঙ্কোচন হয় এবং মুদ্রা ব্যবহার হ্রাস পাওয়ার ফলে নগদে বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা রদ হয়। তার পরিবর্তে পদস্থ কর্মচারীদের একটি ভূমি বা এলাকার প্রশাসনিক ও রাজস্ব ভোগের অধিকার দেওয়া হল। এই জাতীয় ব্যবস্থায় একদল অভিজাত ভূস্বামীদের উত্থান ঘটে যারা প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। তবে অগ্রহার ব্যবস্থায় জমি যেমন রাজস্ব মুক্ত করে দেওয়া হত। এই ক্ষেত্রে সামন্তরা নিজের এলাকা থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ কর এবং প্রয়োজনে সামরিক বাহিনীর সেবা রাজাকে দিতে বাধ্য থাকতেন।

এর ফলে ভূমি ব্যবস্থা ও আঞ্চলিক ক্ষমতা বিন্যাসের ক্ষেত্রে সামন্তদের স্বার্থ ও ক্ষমতা কায়েম হবার প্রশস্ত সুযোগ দেখা যায়। পাল রাজা তৃতীয় বিগ্রহ পালের আমলে (১০৫৫-৭০) এক সামন্ত তাঁর ভোগাধিকার থেকে জমিদান করছেন বলে আমগাছি তাম্রশাসন থেকে জানা যায়। এই ব্যাপারটি ইঙ্গিত করে যে একজন সামন্ত উপস্বত্বভোগী ক্ষুদ্রতর বা অধীনস্থ সামন্ত সৃষ্টি করতে পারতেন। রাজা এবং কৃষকের মধ্যে অনেকগুলি স্তরের উদ্ভব ঘটে এবং রাজনৈতিক কাঠামো, সম্পদ সংগ্রহে বা বিতরণের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ দুর্বল হয়ে পড়ে এবং সমস্ত রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকৃত রূপ নেয়।

সমুদ্রগুপ্তের অধীনস্থ জায়গীরদারদের জন্য সামন্ত শব্দের প্রয়োগ করা হয়নি। বানভট্ট তাঁর 'হর্ষচরিত' গ্রন্থে সমুদ্রগুপ্তের শিলালিপিতে প্রাপ্ত লেখর যে টীকা লিখেছেন, তা থেকে জানা যায় যে সম্রাট সামন্তগণ কর্তৃক প্রশাসিত অঞ্চলের প্রজাদের কাছে থেকে কর আদায় না করে সামন্তদের কাছ থেকে বার্ষিক কর আদায় করতেন। পালদের ভূমি অনুদানপত্রে উল্লিখিত রাজা, রাজপুত্র, মহাসামন্ত,

মহাসামন্তাধিপতি ইত্যাদি উপাধিকারীগণ সম্ভবত এমন সামন্ত ছিলেন যাদের মধ্যে অধিকাংশের সম্পর্ক ছিল ভূমির সঙ্গে কয়েকজনকে পরাজিত করার পরে অধীনস্থ সামন্তরূপে স্বস্ব ক্ষেত্রে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল আবার কয়েকজন সামন্তকে সৈন্য সরবরাহের শর্তে ভূমি অনুদান দেওয়া হয়েছিল। সামন্তীকরণের এই প্রক্রিয়া সমগ্র সমাজকে প্রভাবিত করেছিল এবং যতক্ষণ না কোন পদকে সামন্তীয় উপাধিতে ভূষিত করা হত, ততক্ষণ তার কোন মহত্ত্ব প্রকাশ পেত না।

দেবপালের সময় থেকে পালরাজাদের দ্বারা জারি করা অনুদানপত্র থেকে জানা যায় যে উত্তরভারতের বহু অধীনস্থ নরপতি নিজ নিজ সৈন্য সহযোগে দেবপালের সাহায্যের জন্য উপস্থিত ছিলেন। সন্ধ্যাকর নন্দী রচিত 'রামচরিতম' কাব্য থেকে জানা যায় যে পালবংশের অন্তিম পর্বে উত্তরবঙ্গে কৈবর্ত্ত বিদ্রোহ ঘটলে উত্তরবঙ্গ পালদের হস্তচ্যুত হয়। পাল রাজা রামপালকে এই বিদ্রোহ দমনের জন্য 'সামন্তচক্রের' সাহায্য গ্রহণ করতে হয় এবং বহু ভূসম্পদ ও অন্যান্য সম্পত্তি দান করে তিনি সামন্তদের সমর্থন যোগাড় করতে পেরেছিলেন। এইসব আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি যে ধর্মীয় দান বা ধর্মনিরপেক্ষ দান, এই দুইয়ে মিলে রাজা ও প্রকৃত চাষীদের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ মধ্যস্বত্বভোগীর উদ্ভাবন ঘটেছিল এবং এদের উপস্থিতি বাংলার অর্থনৈতিক উৎপাদন প্রক্রিয়াকে যথেষ্টভাবে প্রভাবিত করেছিল।

২.৫ কৃষি ব্যবস্থা

বাংলা মূলতঃ কৃষি প্রধান দেশ। কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যে ধান উৎপাদন ছিল সর্বপ্রধান। মহাকবি কালিদাসের কাব্যে বঙ্গের ধানের প্রশংসা করা হয়েছে। খুব প্রাচীনকাল থেকে বাংলায় আখের চাষ হত। ইক্ষুর রস থেকে প্রচুর পরিমাণে চিনি ও গুড় প্রস্তুত করে বিদেশে চালান করা হত। ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র মজুমদার তাঁর বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রাচীন যুগ গ্রন্থে বলেছেন যে অধিক পরিমাণে গুড় উৎপাদিত হত বলে এদেশের নাম 'গৌড়' ছিল। পুণ্ড (উত্তর বঙ্গের ভূখণ্ড, বর্তমানে বাংলাদেশের রাজশাহী, দিনাজপুর জেলার অর্ন্তভুক্ত) দেশের আখ বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। ধান ও আখ একই সাথে চাষ করা হত, অর্থাৎ একই সঙ্গে খাদ্যশস্য ও পণ্যশস্যের উৎপাদন পদ্ধতি জানা ছিল। বিভিন্ন ধরনের জমি ও জমির মাপ নেওয়ার পদ্ধতির কথা আগেই বলা হয়েছে। অগ্রহার ব্যবস্থার উদ্ভব ও বিকাশের ফলে একটি স্বনির্ভর গ্রামীণ অর্থনীতির জন্ম হয় এবং গ্রামের উৎপাদন গ্রামেই ভোগ করা

হত। এই আদি মধ্যযুগ পর্বে রচিত কৃষি পরাশর, কৃষিসূক্তি প্রভৃতি কৃষিবিদ্যা সম্বন্ধীয় গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে কৃষি অর্থনীতির গুরুত্ব এই সময় বৃদ্ধি পেয়েছিল। শূন্য পুরাণে বলা হয়েছে যে অন্ততঃ পঞ্চাশ রকমের ধান প্রাচীন বাংলায় উৎপন্ন হত। আদি মধ্যযুগের বাংলার একটি লেখতে 'বারজিকের' উল্লেখ আছে যা থেকে বলা যায় যে বাংলায় অনেক পানের বরজ ছিল। তুলা ও তৈলবীজের চাষও বহুল পরিমাণে হত। চীনা রাজকর্মচারী চৌ-জু-কুয়া তাঁর চু-কান-চি (১২৫৭ খ্রীঃ) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে দক্ষিণপূর্ব বাংলাদেশ ছিল তুলো উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত। এছাড়া নারিকেল ও সুপারির চাষ করার কথা এই সময়ে জানা যায়। কৃষি উৎপাদনের প্রসার ঘটানোর জন্য বড় লাঙ্গাল এবং ঢেঁকি ব্যবহৃত হত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'হল' কাঠের তৈরী ছিল। উন্নত কৃষি উৎপাদনের একটি আবশ্যিক শর্ত ছিল জলসেচের সুবন্দোবস্ত। জলসেচের ব্যবস্থা করে কৃষি অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। রামচরিত গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে রাজা রামপাল বরেন্দ্র অঞ্চলে এক বিশাল দীঘি খনন করে জলসেচের ব্যবস্থা করেছিলেন।

স্থানীয়ভাবে স্থানীয় প্রয়োজন পূর্ণ করাই ছিল সামন্তবাদী অর্থব্যবস্থার ভিত্তি। পালদের আমলে গ্রামগুলির এই অবস্থাই ছিল। ব্রাহ্মণ থেকে শুরু করে চাষী, চণ্ডাল, সকল শ্রেণির লোক গ্রামে বসবাস করত। গ্রামের স্বনির্ভর অর্থব্যবস্থা অব্যাহত রাখার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদন করতে সক্ষম সকল শ্রেণির ব্যক্তিরই আবশ্যকতা ছিল।

২.৬ শিল্প ব্যবস্থা

বাংলা কৃষি প্রধান দেশ হলেও এখানে নানাবিধ শিল্পজাত দ্রব্য প্রস্তুত হত। বস্ত্রশিল্পের গুরুত্ব আগের যুগের মতই অব্যাহত ছিল। কার্পাস তুলার কাপড়ের জন্য বঙ্গ বিখ্যাত ছিল। খুব প্রাচীন কাল থেকেই বাংলার বস্ত্রশিল্প যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছিল। হেমচন্দ্র রচিত 'প্রবন্ধচিন্তামনি' গ্রন্থে তুলো পেঁজার জন্য ধনুর ব্যবহারের উল্লেখ আছে। সমকালীন সাহিত্য, লেখমালা এবং আরব পর্যটকদের বিবরণ থেকে জানা যায় যে বাংলা বস্ত্র উৎপাদনের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল। বাংলার কারিগরেরা ধাতু শিল্পের সঙ্গে যথেষ্ট পরিচিত ছিল। লোহা, ব্রোঞ্জ ও তামার ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। বিলাসিতার উপকরণ যোগানোর জন্য স্বর্ণকার, মণিকার প্রভৃতি শিল্পেরও উন্নতি ঘটেছিল। কাষ্ঠশিল্পে এবং হাতীর দাঁতের কাজ একটি উচ্চশ্রেণির শিল্প ছিল। ধাতুর ব্যবহার অস্ত্র নির্মাণ শিল্পে, বিশেষত তরোয়াল উৎপাদনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ

ছিল। রাজা ভোজের 'মুক্তিকল্পতরু' গ্রন্থে পাল সাম্রাজ্যের অধীনস্থ মগধ ও অঙ্গাদেশে উন্নতমানের তরোয়াল নির্মিত হত। অনেক আরব লেখক ও পাল সাম্রাজ্যে নির্মিত তরোয়ালের প্রশংসা করেছেন।

সমসাময়িক লেখমালা, ধর্মশাস্ত্র এবং বিভিন্ন তথ্যসূত্রে শ্রেণির উল্লেখ করা হয়েছে। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকেই উত্তর ভারতের কারিগরী শিল্পে পেশাদারী সংগঠনের আবির্ভাব ঘটেছিল। বিজয়সেনের দেওপাড়া লিপি থেকে জানা যায় যে বরেন্দ্রশিল্পীগণ গোষ্ঠী একটি বিধিবদ্ধ সংঘ ছিল। এইরূপ সংঘবদ্ধ শিল্পী জীবনের ফলে বাংলাদেশে নানা শিল্পীগোষ্ঠী বিভিন্ন বিশিষ্ট জাতিতে পরিণত হয়েছিল। আদি মধ্যযুগে শ্রেণির প্রভাব কিছুটা হ্রাস পেয়েছিল। শ্রেণির আভ্যন্তরীণ পরিচালন ব্যবস্থায় শাসকীয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ায় শ্রেণির স্বাতন্ত্র্য বিঘ্নিত হয়েছিল। ভূস্বামী শ্রেণির উদ্ভবের ফলে শ্রমিক শ্রেণির বড় অংশ ভূস্বামীর এলাকায় নিযুক্ত হয়। শ্রেণির শিল্পসংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ চালাবার জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম ও শ্রমিক অপ্রতুল হয়ে পড়ে কারণ অধিকাংশ শ্রমিকেরই কৃষিতে নিযুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। আদি মধ্যযুগে শ্রেণি সংঘগুলি জাতি ভিত্তিক সংঘে পরিণত হয়। এইভাবে রাজকীয় হস্তক্ষেপ, শ্রেণিগুলির সামাজিক চরিত্রের পরিবর্তন ও শ্রমিকের অপ্রতুলতার ফলে শিল্প সংগঠনগুলি এই সময়ে অবক্ষয়ের শিকার হয়।

২.৭ ব্যবসা-বাণিজ্য

বাংলায় প্রাচীনকাল থেকেই বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছিল। বাংলায় বহু নদনদী থাকায় শিল্পজাত দ্রব্যাদি নানা স্থানে প্রেরণের যথেষ্ট সুবিধা ছিল। রামশরণ শর্মার মতানুযায়ী সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বিকাশের ফলে ব্যবসা বাণিজ্যের সঙ্কোচন ঘটেছিল। রোম-ভারত বাণিজ্যের সময় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে উপমহাদেশে যে ভূমিকা দেখা গিয়েছিল তার তুলনায় পঞ্চম শতাব্দীর বাণিজ্যের পরিধি অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছিল। অগ্রহার ব্যবস্থার বিকাশের ফলে যে স্বনির্ভর গ্রামীণ অর্থনীতির উদ্ভব হয় সেখানে লেনদেনের জন্য যথেষ্ট উৎপাদন হত না। উৎপাদন এবং ভোগ গ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকায় উদ্বৃত্ত উৎপাদন কমে যায় এবং এই অবস্থা বাণিজ্যের পক্ষে প্রতিকূল হয়ে পড়ে। তার প্রমাণ হিসেবে শর্মা বলেছেন যে, পঞ্চম শতাব্দীর পর থেকে ধাতু মুদ্রার ব্যবহারের ক্ষেত্রে পতন দেখা দেয়। পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকে শিল্পী, শ্রেষ্ঠী ইত্যাদি গোষ্ঠী রাষ্ট্রের আনুকুল্য লাভ করেছিল। ষষ্ঠ, সপ্তম শতকে ভূমি নির্ভর সামন্তপ্রথা প্রতিষ্ঠার ফলে রাষ্ট্রের সাথে এই ভূম্যাধিকারী শ্রেণির সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ হল এবং অষ্টম

শতক থেকে বাংলার শিল্প বাণিজ্যের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের সাথে ভূম্যধিকারীর সম্পর্কের নিবিড়তা আরো বৃদ্ধি পেল। পাল ও সেন আমলে ভূস্বামী শ্রেণিই রাষ্ট্রের প্রধান সহায় ও পোষক এবং রাষ্ট্রও এদের সহায়ক। ভূমি নির্ভর সমাজে তাই বণিক-ব্যবসায়ী শ্রেণিকে সম্ভবতঃ অবজ্ঞা করা হয়েছিল এবং শিল্প ব্যবসা-বাণিজ্য ধনোৎপাদনের আর প্রধান সহায় ছিল না বলে ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় মনে করেন।

কিন্তু আদি মধ্যযুগে বাংলার ব্যবসা বাণিজ্যের পুরোপুরি অধোগতি হয়েছিল, এই ধারণা গ্রহণযোগ্য নয়। ৬০০-১০০০ খ্রীঃ পর্যন্ত সময়ে বাণিজ্যের গতিময়তা ও সজীব চরিত্র বজায় ছিল। পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকের বাংলার তাম্রশাসনগুলিতে বণিকদের উপস্থিতি লক্ষণীয়। এই তাম্রশাসনগুলি থেকে জানা যায় যে, জেলাধিকারিককে সহায়তা করার জন্য জেলাস্তরে একটি সমিতি ছিল এবং তার অন্যতম দুই সদস্য ছিলেন নগরশ্রেষ্ঠী ও সার্থবাহ। নগরশ্রেষ্ঠী জেলার প্রধান নগরের অগ্রগণ্য শ্রেষ্ঠী ছিলেন। বণিক ব্যবসায়ীদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ছিল তৈলিক, তৌলিক, মোদক ও সুবর্ণবণিক ইত্যাদি এবং কারিগরদের মত বণিকরাও সম্ভবত পেশাদারী সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন।

সমগ্র উপমহাদেশেই যে ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য যাতায়াত করা মোটামোটি সম্ভব পর ছিল, তা ফা-হিয়েন ও হিউয়েন সাঙয়ের বিবরণী থেকে জানা যায়। আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের জন্য নদীপথের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। প্রাচীন বাংলার তাম্রশাসনগুলিতে এই বিষয়ের প্রমাণ পাওয়া যায়। বাংলা নদীমাতৃক অঞ্চল হওয়ায় নদীপথে যাতায়াত সুলভ ছিল। পূর্ব উপকূলে বাণিজ্যিক সম্পর্ক মূলত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাথে। প্রাচীন বাংলার প্রধান বন্দর তাম্রলিপ্ত (তমলুক, মেদিনীপুর জেলা) এই সময়ে খুব জনপ্রিয় ছিল। তাম্রলিপ্ত বন্দরের সঙ্গে চীনের যোগাযোগ ছিল অপ্রত্যক্ষভাবে। খ্রীষ্টপূর্ব সময়ের শেষের কয়েক শতাব্দী থেকে গুপ্ত যুগ (অর্থাৎ ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত) তাম্রলিপ্ত গঙ্গা এবং বঙ্গ দেশের অর্ন্তভুক্ত ছিল। এই অঞ্চলের আর এক বন্দর ছিল গাঙ্গে যার অবস্থান ছিল খুব সম্ভবতঃ উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার দেগঙ্গা এলাকায় এবং গঙ্গার এক শাখা যমুনা নদীর উপরে। ষষ্ঠ সপ্তম শতাব্দীতে তাম্রলিপ্ত সুক্ষ দেশের বন্দর হিসাবে চিহ্নিত হয়। এই বন্দরের প্রশংসা দুই চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন ও হিউয়েন সাঙের লেখনীতে বিবৃত আছে। এই বন্দর বঙ্গোপসাগর তথা ভারত মহাসাগরের পূর্বাংশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল। প্রাচীন বাংলার সমতট অঞ্চলও ধীরে ধীরে দূরপাল্লার সমুদ্র বাণিজ্যে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

বঙ্গাদেশ থেকে নানারূপ দ্রব্যের আমদানি ও রপ্তানির বর্ণনা পাওয়া যায়। রপ্তানির তালিকায় ছিল ঘষা কাঁচ, খুব উঁচুদরের সূক্ষ্ম কার্পাস বস্তু ও চাল ইত্যাদি। ষষ্ঠ সপ্তম শতকে ব্রহ্মদেশ, মালয়, ইন্দোনেশিয়া ও সিংহল প্রভৃতি দেশের সাথে পূর্ব ভারতের যোগাযোগের অতি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল এই তাম্রলিপ্ত বন্দর। পশ্চিম ভারতের বন্দরগুলির সঙ্গে অথবা উপমহাদেশের পশ্চিমে আরব সাগরবর্তী কোন দেশের সঙ্গে তাম্রলিপ্তির সরাসরি যোগাযোগ যে একেবারে ছিল না, তা বলা যায় না। তাম্রলিপ্ত থেকে প্রায় নিয়মিতভাবে জাহাজ ভর্তি ঘোড়া নিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যাত্রা করা হত। সপ্তম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে তাম্রলিপ্তর সামুদ্রিক বাণিজ্যের অবস্থা ভাল ছিল। অষ্টম শতাব্দীতেও এই "সামুদ্রিক" বন্দরের গুরুত্ব হয়ত ছিল কিন্তু এর পরে আর কোন প্রাচীন কালের তথ্যসূত্রে এই বন্দর মারফৎ সামুদ্রিক বাণিজ্যের পরিমাণকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। নবম শতকের শেষে ও দশম শতকের গোড়া থেকে আরব বিবরণীতে সমন্দর নামক এক অতি সমৃদ্ধ বন্দরের কথা জানা যায়। এই বন্দর বর্তমানে চট্টোগ্রামের কাছে অবস্থিত। ইবন খোরদাদবা বা অল ইদ্রিসির বিবরণে এই অঞ্চলের বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির স্পষ্ট প্রমাণ আছে। এই বন্দরে বাণিজ্যরত বণিকেরা যথেষ্ট লাভ করতেন। আরব লেখকেরা সমন্দরের সঙ্গে উড়িষ্যা ও কাঞ্জাভারমের যোগাযোগের কথা উল্লেখ করেছেন। শ্রীলঙ্কা থেকে সমন্দর সমুদ্রপথে পৌঁছনোর কথা আরব লেখাতে পাওয়া যায়। আদিমধ্যযুগে সমন্দর বা সুদকাওয়ানের উত্থান বাংলাকে পশ্চিম এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে যুগপৎ বাণিজ্যিক লেনদেনে যুক্ত করে দেয়।

২.৮ মুদ্রা ব্যবস্থা

জমি দানের তাম্রশাসনের মত মুদ্রাকে রাজনৈতিক এবং কখনও ধর্ম ও শিল্প সম্বন্ধে জানার উপায় হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ, অর্থনৈতিক বিনিময় ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে জানার ব্যাপারে মুদ্রার ভূমিকা অপরিসীম। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় সম্ভবত খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতক থেকেই বাংলায় মুদ্রা প্রচলন আরম্ভ হয়েছিল। ভারতবর্ষের সর্ব প্রাচীন ছাপ কাটা (Punch marked) মুদ্রা বাংলায় অনেক পাওয়া গেছে।

ঐতিহাসিক রামশরণ শর্মা তাঁর 'Early Medieval Society' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম থেকে স্বর্ণমুদ্রার সংখ্যা এবং স্বর্ণের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছিল। গুপ্ত সম্রাটগণ প্রাচীন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্বর্ণমুদ্রার প্রবর্তন করেছিলেন। গুপ্ত শাসনের পরবর্তীকালে স্বর্ণমুদ্রার ধাতব

বিশুদ্ধি ক্রমশ কমতে থাকে। স্বর্ণমুদ্রা বা রৌপ্যমুদ্রা সাধারণত বৈদেশিক বা দুরপাল্লার বাণিজ্যে ব্যবহৃত হয়। ষষ্ঠ এবং দশম শতকের মধ্যে অনেক আঞ্চলিক শক্তির উত্থান ঘটে। উত্তর, মধ্য ও পূর্ব ভারতে গুপ্তযুগের পরবর্তীকালে মুদ্রা ব্যবহার খুব কম পরিমাণে প্রচলিত ছিল। রামশরণ শর্মা দেখিয়েছেন যে বাণিজ্যের পরিধি সামন্তব্যবস্থার ফলে সঙ্কুচিত হওয়ায় দৈনন্দিন জীবনে মুদ্রার ব্যবহার কমে গিয়েছিল। ফা-হিয়েনের বিবরণ অনুসারে নিত্যকার লেনদেন কড়িতে চলত। মুদ্রা ভিত্তিক অর্থনীতি কার্যতঃ ৬০০-১০০০ খ্রীঃ মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে যায়। বিনিময় ব্যবস্থায় মুদ্রার স্থলাভিষিক্ত হয় কড়ি যা তাম্রশাসনে কপর্দক বলে উল্লিখিত। কড়ি দিয়ে বৈদেশিক বাণিজ্য চলা কঠিন হয়ে পড়েছিল। ফলে যতটুকু বাণিজ্য ছিল তা স্থানীয় ভিত্তিতে হত এবং তার ফলে সামন্ত ব্যবস্থায় উদ্ভুত সম্পূর্ণ গ্রামীণ অর্থনীতির অবসান সম্ভব ছিল না।

হর্ষবর্ধন, শশাঙ্ক এবং সমাচারদেবের আমলে এবং তার পরবর্তীকালে গুপ্ত অনুকরণে তৈরী কিছু স্বর্ণমুদ্রা দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা এবং বাংলাদেশে পাওয়া গেছে। কিন্তু সৌন্দর্য্য এবং শুদ্ধতার দিক থেকে এই মুদ্রাগুলি ছিল খুব নিম্ন মানের এবং অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে এই সব মুদ্রা অচল হয়ে যায়। ডঃ নীহার রঞ্জন রায়ের মতে বাংলার কোথাও পাল বা সেন রাজাদের প্রবর্তিত একটি স্বর্ণমুদ্রাও পাওয়া যায়নি। সমকালীন সাহিত্যেও কোন স্বর্ণমুদ্রার উল্লেখ নেই।

দক্ষিণপূর্ব বাংলাদেশের ময়নামতীতে আদি মধ্যযুগীয় পর্বের রৌপ্যমুদ্রার সন্ধান পাওয়া গেছে। ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন যে খ্রীষ্ট্রীয় সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত দক্ষিণ-পূর্ব বাংলাদেশে নিরবছিন্ন ভাবে রৌপ্যমুদ্রার প্রচলন ছিল। এই মুদ্রাগুলির উপর হরিকেল (নোয়াখালি, কুমিল্লা), পট্টিক (পাইটকারা) প্রভৃতি স্থানের নাম খোদিত আছে। এই মুদ্রাগুলির উপর আরকানের মুদ্রার প্রভাব আছে বলে মনে করা হয়। মুদ্রাগুলি রৌপ্যনির্মিত এবং এর একপিঠে কৃষ্ণমূর্তি এবং অপরদিকে ত্রিশূল জাতীয় বস্তুর প্রতিকৃতি অঙ্কিত আছে। দশম শতকের মুদ্রাগুলির আকার, পরিমাণ ও ওজনে পরিবর্তন করা হয়েছে। সম্ভবত উত্তর ভারতে প্রচলিত 'পুরাণ', 'ধরণ', 'কার্ষাপর্ণ' 'দ্রম্ম' নামক রৌপ্য মুদ্রাগুলির সাথে বিনিময়যোগ্য করে তোলার জন্য এই পরিবর্তন ঘটানো হয়েছিল। পশ্চিম এশিয়ায় 'দিরহাম' জাতীয় মুদ্রাগুলির সাথে হরিকেল মুদ্রার ওজনগত সাদৃশ্য ঘটানো হয়। সম্ভবত বাংলাদেশের মুদ্রাগুলিকে উত্তর ভারত ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য এই পরিবর্তন অনিবার্য ছিল। পাহাড়পুর এলাকা থেকে খালিফা হারুণ-আল-রসিদের (৭৮৮ খ্রীঃ)

গোলিকৃতি রৌপ্য মুদ্রার আবিষ্কার থেকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে হরিকেলের অংশ গ্রহণের বিষয়টি প্রমাণিত হয়।

পাল ও সেন রাজাদের আমলে কোন মুদ্রার প্রচলন সম্পর্কে নির্দিষ্ট প্রমাণ না পেলেও বহু তাম্রশাসনে 'কর্পদক' শব্দটির উল্লেখ আছে। কর্পদক বা কড়ি ব্যবহারের এটি স্পষ্ট প্রমাণ। কড়ি প্রাচীন বাংলায় পাওয়া যেত না। মা হুয়ানের চৈনিক বিবরণ (পশ্চদশ শতকের প্রথমদিকে রচিত) থেকে জানা যায় যে, কড়ি বাংলায় আমদানি হত মালদ্বীপ থেকে, তার বদলে বাংলার চাল মালদ্বীপে প্রেরণ করা হত। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে দুরপাল্লার বাণিজ্যে কড়ি বেশি ব্যবহৃত হত না কিন্তু এই কথাটি সত্য বলে প্রমাণিত হয় না। কড়ি সরাসরি দূরপাল্লার সমুদ্র বাণিজ্যেরই সামগ্রী এবং কড়ির উপস্থিতি সরাসরি দূরপাল্লার সমুদ্র বাণিজ্যেরই সামগ্রী এবং তার ব্যবহার কখনও বন্ধ অর্থনীতির পরিচায়ক ছিল না। পুরাণ জাতীয় রৌপ্যমুদ্রা ও কড়ি (যা হরিকেলের মুদ্রার সাথে সমতূল্য) সহজেই বিনিময় করা যেত। ফলে রণবীর চক্রবর্তীর মতে পাল সেন শাসিত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে মুদ্রা না থাকলেও বাণিজ্য স্তব্ধ হয়নি, ঐ অঞ্চলের 'পুরাণ কর্পদক' সহজেই হরিকেলের রৌপ্য মুদ্রার সাথে বিনিময় করা যেত।

ব্যবসার কাজে যে বিপুল পরিমাণ কড়ি লাগত, তা ব্যবসায়ীদের পক্ষে বহন করা কষ্টসাধ্য ছিল। ফলে কড়ির একটি সহজসাধ্য বিকল্পের প্রয়োজন দেখা দেয়। দ্বাদশ শতকের শেষে ও ত্রয়োদশ শতকের গোড়াতে দুটি নতুন শব্দ—কার্ষাপণ ও চুর্ণী ব্যবহৃত হতে থাকে। চূর্ণ কথাটির অর্থ চূর্ণ বা গুঁড়ো। সোনা বা রূপোর গুঁড়ো দিয়ে ব্যবসা চালানো হত। একটি রূপার মুদ্রাতে যে পরিমাণ রূপো থাকে তার সমান ওজনের বিশুদ্ধ রূপো চূর্ণ করে বণিকেরা নিয়ে যেতেন এবং লেনদেনের সময় রূপোর মুদ্রার পরিবর্তে সমপরিমাণ 'রৌপ্যচূর্ণ' দিয়ে ব্যবসা করতেন। চূর্ণীর ব্যবহার শুরু হওয়ার ফলে প্রচুর পরিমাণ কড়ি নিয়ে ব্যবসায়ীদের যাতায়াতের অসুবিধা অনেকটাই লাঘব হয়েছিল। আদি মধ্যযুগে বাংলার বিনিময় মাধ্যমে রণবীর চক্রবর্তী মুদ্রার তিনটি স্তরের উল্লেখ করেছেন। এই ত্রিস্তর ব্যবস্থার সর্বনিম্ন পর্যায়ে ছিল কড়ি বা কর্পদক, মধ্যবর্তী স্তরে ছিল ধাতবচূর্ণ (চূর্ণী) এবং সর্বোচ্চ পর্যায়ে ধাতব মুদ্রা যেমন কার্ষাপণ, দ্রম্ম মুদ্রা ইত্যাদি।

২.৯ নগরায়ণ

গ্রামকেন্দ্রিক স্বনির্ভর অর্থনীতির উদ্ভব এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপকতা কমে যাওয়ার ফলে নগরের প্রয়োজনীয়তা সীমিত হয়। রাম শরণ শর্মার মতানুযায়ী ৩০০-৬০০ খ্রীঃ, এই সময় সীমার মধ্যে সর্বভারতে নগরের অবক্ষয় দেখা দিয়েছিল। কারিগরী ও পণ্যের বিনিময়ের এলাকা হিসেবে নগরের বিশিষ্ট ভূমিকা আদি মধ্যযুগে বিনষ্ট হয়েছিল। খ্রীষ্টপূর্ব শতক থেকে ষষ্ঠ সপ্তম শতক পর্যন্ত প্রাচীন বাংলার যতগুলি নগরের খবর পাওয়া গেছে, তার অধিকাংশই প্রধানতঃ ব্যবসা-বাণিজ্য নির্ভর। তাম্রলিপ্ত, পুণ্ডনগর, বর্ধমান, গঙ্গাবন্দর নগর প্রভৃতি সমস্ত নগরেই সুপ্রশস্ত ব্যবসা বাণিজ্যের পথের উপর অবস্থিত ছিল এবং বাণিজ্য সমৃদ্ধির উপর নির্ভর করত। গঙ্গা বন্দর ও তাম্রলিপ্তর গুরুত্ব নিরঙ্কুশ ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল ; কিন্তু কোটিবর্ষ প্রধানত রাষ্ট্রীয় ও সামরিক প্রয়োজনে গড়ে উঠলেও এই নগরের বাণিজ্য ও তীর্থ মহিমা ছিল। ডঃ নীহার রঞ্জন রায়ের বক্তব্য অনুযায়ী ষষ্ঠ সপ্তম শতক পর্যন্ত প্রাচীন বাংলার সব কয়টি নগরেই মর্যাদা ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর নির্ভরশীল ছিল সপ্তম শতকও তারপর বাণিজ্যের অবনতি দেখা দিলে বাংলার নগরের আকৃতি ও প্রকৃতি ধীরে ধীরে বদলাতে শুরু করে। হিউয়েন সাঙ বাণিজ্য নগর হিসেবে তাম্রলিপ্তর নামই উল্লেখ করেছেন। অষ্টম নবম শতকের থেকে আরম্ভ করে হিন্দু আমলের শেষ পর্যন্ত যে কয়টি নগরের উল্লেখ পাওয়া যায়, সেইগুলি প্রধানত রাজনৈতিক এবং সামরিক কেন্দ্র হিসেবে গুরুত্ব লাভ করেছিল, বাণিজ্যিক কেন্দ্র রূপে নয়।

২.১০ বাহমনী রাজ্যের অর্থনীতি

দক্ষিণ ভারতে আধিপত্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে দিল্লী সুলতানেরা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কয়েকটি অভিযান দাক্ষিণাত্যে পরিচালনা করেছিলেন। দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলির মধ্যে এর ফলে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। চতুর্দশ শতাব্দীতে তুর্কী প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বাহমনী বংশের সূচনা হয়েছিল। বাহমনী ছাড়া দাক্ষিণাত্যের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যের নাম ছিল বিজয়নগর। দক্ষিণ ভারতের ইতিহাসে চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দী ধরে দেখা যায় বিজয়নগর ও বাহমনী রাজ্যের দ্বন্দ্ব। এই দুটি রাজ্যের সংঘর্ষের মূল কারণ ছিল কৃষ্ণা ও তুঙ্গাভদ্রা নদী দুটির মধ্যবর্তী উর্বরা রায়চুর দোয়াব অঞ্চল নিয়ে। কৃষ্ণা, তুঙ্গাভদ্রা অঞ্চল ছিল ভীষণ সমৃদ্ধশালী এবং অনেক বন্দরের উপস্থিতি অঞ্চলটিকে ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্রে পরিণত করেছিল।

বাহমনী রাজ্যের প্রধান আয় ছিল ভূমি রাজস্ব। শাসনবিভাগের মূল কার্যই ছিল রাজস্বের আয় ও ব্যয়ের হিসাব রাখা। বাহমনী রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী মামুদ গওয়ন ভূমি রাজস্ব দপ্তরে জমি জরিপ করে রাজস্ব নির্ধারণ করেছিলেন। প্রাদেশিক শাসনকর্তারা রাজস্ব আদায় করতেন ও নির্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্য রাজাকে সরবরাহ করতেন। যুদ্ধের সময় রাজা সৈন্যের জন্য শাসনকর্তাদের উপর নির্ভর করতেন। জমির গুণাগুণ অনুসারে রাজস্ব নির্ধারিত হত। রুশ বণিক অ্যাথানাসিয়াম নিকিতিন বাহমনীর রাজধানী বিদারে কিছুদিন বাস করেছিলেন (১৪৭০-৭৪)। তার নথি থেকে আমরা জানতে পারি যে জমিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপ ছিল। অভিজাতদের বিলাসবহুল জীবনের তুলনায় সাধারণ মানুষের দুর্বিসহ জীবন ছিল। জমিতে মালিক শ্রেণি ছাড়া ছিল অনেক ভূমিহীন কৃষক যারা অন্যের জমিতে কৃষি কাজ করত। এবং অনেকের অবস্থা প্রায় ভূমিদাসের মত ছিল। সেচ ব্যবস্থার দিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। বড় জলাশয়, বাঁধ ইত্যাদি কৃষি কার্যের জন্য নির্মিত হত।

বাণিজ্যিক রাজস্বের মধ্যে ছিল উৎপন্ন পণ্যের উপর বিভিন্ন আদায়, শুল্ক ও কর। এছাড়া সম্পত্তির উপর কর আরোপ করা হত। কৃষি ছাড়া অন্যান্য বৃত্তির মানুষদের বৃত্তিকর দিতে হত। গ্রামগুলি অনেকটা স্বয়ংসম্পূর্ণ ও পরস্পর বিচ্ছিন্ন ছিল।

গ্রাম বা শহরের কারিগরেরা সামাজিক মর্যাদা লাভ করেছিলেন। ছুতোর, স্বর্ণকার ও কামারদের সম্মান বেশি ছিল। কারিগরদের নিজস্ব সমবায় সংঘ ছিল। সংঘগুলি ব্যবসায়ীদের সমবায় সংঘের জন্যই কাজ করত। বিদেশী বণিকদের নানারকম সুবিধা দেওয়া হত এবং আমদানি করা সামগ্রীর উপর শুল্কের হার চড়া ছিল না। ব্যবসায়ীদের সংঘগুলি কারিগরদের সংঘ থেকে অনেক বড় পরিধিতে কাজকর্ম করত।

বণিকরা ব্যবসার কাজে একস্থান থেকে অপর স্থানে গমন করতেন। আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ও বৈদেশিক বাণিজ্য উভয় থেকেই রাজস্ব আয় হত। ধাতু এবং গহনা শিল্প যথেষ্ট উন্নত ছিল। অস্ত্র নির্মাণের জন্য লোহার ব্যবহার হত। হাতী, মুক্তা, হীরা, লবঙ্গ, চন্দন, মশলা এবং সুগন্ধী প্রভৃতি জিনিসগুলি ছিল বাণিজ্যের প্রধান উপকরণ। আরব থেকে ঘোড়াদের আমদানি করা হত এবং বাহমনী রাজ্যের উত্থানের পর এই বাণিজ্যের পরিমাণ আরো বৃদ্ধি পায়, বারবোসা জানিয়েছেন যে ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দে গম, চাল, সুক্ষ্ম মসলিন প্রভৃতি বাহমনী রাজ্যে উৎপাদিত হত এবং চাওল বন্দরের মাধ্যমে রপ্তানী করা হত। চাওল বন্দর থেকে অভ্যন্তরে একটি বড় বাজারের অবস্থান ছিল সেখানে যাঁড়ের পিঠে করে বণিকেরা সামগ্রী নিয়ে আসতেন বিক্রির জন্য।

২.১১ উপসংহার

অবশেষে আমরা সমস্ত কিছু বিশ্লেষণ করে বলতে পারি যে, নিষ্কর জমিদানের মাধ্যমে ভারতে সামন্তব্যবস্থার বীজ বপন করা হয়েছে। অগ্রহার দানের রীতি প্রথমে ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল ; ক্রমশঃ তা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ভূমি দান প্রথমে জড়িত ছিল ধর্মীয় এবং ধর্মপ্রতিষ্ঠানের সাথে। পরবর্তীকালে রাজা অনেক ভূমি দান করেছেন সামরিক এবং বেসামরিক ব্যক্তিদেরকে। জমিকে কেন্দ্র করে রাজা এবং কৃষকদের মধ্যে মধ্যবর্তী শ্রেণির আবির্ভাব ঘটেছিল যা সামন্তপ্রথাকে বিশেষভাবে শক্ত করেছিল। সামন্ত ব্যবস্থার উন্মেষের সময় ধরা হয় ৩০০-৬০০ খ্রীঃ সময়সীমায় ; ৬০০-৯০০ খ্রীঃ সময়েতে এই ব্যবস্থার ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায় এবং চূড়ান্ত রূপটি ৯০০-১২০০ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষিত হয়। তৎকালীন বাংলার অর্থনৈতিক মূল বৈশিষ্টগুলি ছিল—ভূমির উপর রাজকীয় ও সামূহিক অধিকারের ক্রমহ্রাসমানতা, ব্যক্তিগত মালিকানার বিকাশ, নতুন নতুন কর আরোপ ও বেগার প্রথার জন্য কৃষকদের অবস্থার ক্রমাবনতি, স্বনির্ভর অর্থব্যবস্থা, মুদ্রার অপেক্ষাকৃত কম ব্যবহার এবং ব্যবসা বাণিজ্যের অবনতি। গ্রামীণ জনগণ জমিতে তাদের পূর্বাধিকার হারিয়েছিলেন এবং এই নতুন অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যগুলি পঞ্চম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাংলার অর্থনৈতিক জীবনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল।

২.১২ অনুশীলনী

১। অগ্রহার ব্যবস্থা কাকে বলে ? বাংলার অর্থনীতিকে অগ্রহার ব্যবস্থা কীভাবে প্রভাবিত করেছিল ?

২। সামন্ততন্ত্রের উদ্ভবের কারণগুলি কি ছিল ?

৩। আদি মধ্যযুগে বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর একটি প্রবন্ধ লেখ।

৪। পঞ্চম শতাব্দীর পরবর্তী কালে বাংলার ব্যবসা বাণিজ্যের অবস্থা কিরকম ছিল ?

৫। বাহমনীর অর্থনীতির মূল বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।

২.১৩ গ্রন্থপঞ্জি

১। শ্রী রমেশ চন্দ্র মুজমদার—বাংলা দেশের ইতিহাস, প্রাচীন যুগ (কলিকাতা, ১৯৭০)

২। নীহার রঞ্জন রায়—বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব) (কলিকাতা, ১৯৬৫)

৩। রামশরণ শর্মা—ভারতের সামন্ততন্ত্র (কলিকাতা ১৯৭৭)

৪। ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—বঙ্গ, বাঙ্গালা ও ভারত (কলিকাতা, ২০০০)

৫। রোমিলা থাপার—ভারতবর্ষের ইতিহাস (১০০০ খ্রীষ্টাব্দ—১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দ)

৬। রণবীর চক্রবর্তী—প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে (কলিকাতা, ১৯৯৭)

৭। Ram Saran Sharma—Early Medieval Indian Society (Kolkata, 2001)

৮। Tapan Ray Chaudhuri, Irfan Habib (ed.)—The Cambridge Economic History of India Vol–I (C.1200–C.1750) (Delhi, 1984)

৯। K. A. Nilakanta Sastri—A History of South India (Oxford University Press, 1966)

১০। R. C. Majumdar (ed.)—The History and Calture of the Indian People : The Classical Age (Bharatiya Vidya Bhavan Series) (Bombay, 1988)

———————